বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৭ জুলাই- সেপ্টেম্বর-২০০৬

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামী আইন ও বিচার

ISSN 1813 - 0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৭

প্রকাশনায় : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬

যোগাযোগ : এস এম আবদুল্লাহ
সমন্বয়কারী
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা)
১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ : তাসনিম কম্পিউটার, মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম : ৩৫ টাকা US $ 3

Published by Advocate MUHAMMAD NAZRUL ISLAM General Secretary, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. 14, Pisciculture Bhaban (3rd Floor) Shymoli Bus Stand, Dhaka-1207,Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Moghbazar, Dhaka, Price Tk. 35 US $ 3

সূচিপত্র

লেখা আহ্বান

এই পত্রিকায় ইসলামী আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্যভিত্তিক ও গবেষণাধর্মী লেখা এবং সাময়িক প্রসঙ্গ স্থান পাবে। যেমন-

১. ইসলামী আইনের ইতিহাস

২. বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন শাসনামলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ

৩. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা

৪. ইসলামে অর্থনৈতিক, শ্রমনৈতিক, সামাজিক ও নারী অধিকার সংক্রান্ত বিধান

৫. বর্তমান যুগে মুসলিম দেশসমূহে শরীয়াহ আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ও প্রয়োজনীয়তা

৬. ইসলামী আইন ও মানবাধিকার

৭. যুগে যুগে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ইসলামী আইন

৮. গণতন্ত্র ও ইসলাম

৯. ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় সামাজিক সন্ত্রাস ইত্যাদি

লেখার সাথে লেখকের পরিচিতি লিখে পাঠানোকেও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় হতে হবে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ

সম্পাদক

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

১৪ শ্যামলী রিং রোড, পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা), শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬

E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

আপনাদের প্রশ্নের জবাব

ইসলামী আইন ও বিচার এর পাতায় ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ইসলামী শরীয়ত এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সমস্যাবলী সংক্রান্ত প্রশ্ন আহ্বান করা হচ্ছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

বছরে ৪টি সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রহাক ও এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন। নিয়মিত গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্যে রয়েছে বিশেষ ছাড়।

পাঠকের মতামত

পাঠকের মতামত আমরা আগ্রহ সহকারে ছাপাই।

গ্রাহক চাদার হার

প্রতি সংখ্যা : টাকা ৩৫, প্রতি ৬ মাসে : টাকা ৭০, প্রতি বছরে : টাকা ১৩০

সম্পাদকীয়

ইসলামী আইনের সর্বজনীন ব্যবহার

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এমনকি টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্রেরও ধারণা আছে কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো ধারণা নেই। মুসলমানরা যে শাসননীতির ভিত্তিতে বিগত হাজার বছর ধরে অত্যন্ত সফলতার সাথে দুনিয়া শাসন করলো, যেখানে প্রথমদিকে ইসলামী শাসননীতির পুরোপুরি প্রাধান্য ছিল এবং তারপর ধীরে ধীরে ইসলামী শাসননীতির মাত্রা কমে গেলেও তার একটা মুসলমানী মাত্রা শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল– আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সে শাসননীতির আলোচনা না থাকাটা কেবল দুর্ভাগ্যই নয় আধুনিক বিশ্ব মানবতার জন্য বিপর্যয়করও বটে।

আবার বিপর্যস্ত বিশ্ব মানবতার জন্য আশার বাণী নিয়ে এগিয়ে আসছে ইসলাম। মুসলমান ছাড়াও দুনিয়ার অন্য জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। ইসলামী নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার অংগীকার নিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশে অনেকগুলো ইসলামী রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক পথে এগিয়ে আসছে। এখানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অন্য ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে যে অপূর্ণতা আছে ইসলামে তা নেই। ঐ ব্যবস্থাগুলোর কোনোটা নিছক একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা পেশ করছে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য সে পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রের আশ্রয় নিচ্ছে। আবার কোনোটা নিছক একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য একনায়কতন্ত্র বা টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করছে। অন্যদিকে ইসলাম নিজেই একটা পূর্ণাংগ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা ভিত্তিক ব্যবস্থা। এখানে প্রত্যেকটি মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার লাভ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত মত প্রকাশ ও ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে চলার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

আধুনিক বিশ্বের কোনো গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ও সেক্যুলার রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক যদি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির প্রতি বিশ্বস্ত না থাকে তাহলে তাকে কোন চোখে দেখা হবে? তার প্রতি কেমন ব্যবহার করা হবে? এখানে প্রথম কথাই হচ্ছে তাকে অবশ্যই মেইন স্ট্রীমের সাথে মিশে যেতে হবে। তার নিজস্ব আলাদা কোনো সত্তা থাকাটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বরদাশত করবে না। অন্তত আধুনিক বিশ্বের এক নম্বর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমেরিকার রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাই বলে।

এর তুলনায় ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা অনেক উদার। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকরা দুই ভাগে বিভক্ত। যারা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমস্ত নীতি পুরোপুরি মেনে চলে তারা মুসলিম। আর যারা পুরোপুরি মেনে চলে না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে চায় তারা অমুসলিম। তাদের মহিলাদের মুসলমানী রীতি মেনে চলার এবং পথে ঘাটে মাথায় স্কার্ফ বেঁধে চলার জন্য চাপ দেয়া হবে না। কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অগণতান্ত্রিক কারোর জন্য কোনো স্থান নেই এবং কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অসমাজতান্ত্রিক কারোর কোনো স্থান নেই। কিন্তু কোনো ইসলামী বা মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমের স্থান আছে। তারা তাদের নিজস্ব সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে ও এগিয়ে যেতে পারে।

ইসলামী আইনে মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলিম নাগরিকদর উপর ন্যস্ত। মুসলিম নাগরিকদের অবহেলা বা অসতর্কতার কারণে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে এজন্য তারা সর্বতোভাবে দায়ী হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তারা অমুসলিমদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।

মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিমদের বেলায় ইসলামী আইনের প্রয়োগ কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বক্ষেত্রে মুসলিম নাগরিকদের অনুরূপ। এই আইনের কোন কোন ধারা মুসলিম ও অমুসলিম সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য এবং কোন কোন ধারা শুধু মুসলিম নাগরিকদের বেলায় প্রযোজ্য, অমুসলিমদের উপর নয়। এ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

যেমন হুদূদ ও কিসাসের দণ্ডবিধি মুসলিম ও অমুসলিম সকলের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য এখানেও কিছু ব্যতিক্রম আছে। কোন মুসলমান কোন অমুসলিম অথবা কোন অমুসলিম কোন মুসলমানের সম্পদ চুরি করলে উভয়ের বেলায় একইরূপ দণ্ড কার্যকর হবে।

মুসলিম ও অমুসলিম নারী বা পুরুষ নির্বিশেষে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী মুসলিম-অমুসলিম নারী-পুরুষ যেই হোক, সে কাযাফ-এর দণ্ড (এক শত বেত্রাঘাত) ভোগ করবে এবং বিচারিক বিষয়ে অতপর তার সাক্ষ আর কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ সে সাক্ষদানের অযোগ্য ঘোষিত হবে।

কোন অমুসলিম যেনার অপরাধ করলে তার উপর এই অপাধের দণ্ড কার্যকর হবে না। উমর রা. ও আলী রা. বলেন, মুসলিম অধ্যুসিত রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক যেনার অপরাধে লিপ্ত হলে তাকে তার ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে সোপর্দ করতে হবে এবং তারা তাদের ধর্মীয় আইন অনুসারে অপরাধীর বিচার করবে। ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আহমাদ ইবনে হাম্বল র. উপরোক্ত মত গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ ও আবু ইউসুফ র. এর মতে অমুসলিমের উপরও ইসলামী দণ্ডবিধির আওতায় শাস্তি কার্যকর হবে। শেষোক্ত দু'জন মহানবী স. এর কার্যক্রম থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন।

দুই ইয়াহুদী নারী-পুরুষ যেনায় লিপ্ত হলে তাদের সম্প্রদায়ের লোকজন উভয়কে মহানবী স. এর আদালতে হাযির করে। তিনি তাদের উভয়কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

প্রথমোক্ত মত গ্রহণকারীগণ এই হাদীসের জবাবে বলেন, তাদের উভয়কে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তাওরাত কিতাবের বিধান অনুসারে। মহানবী স. এর নিকট অপরাধীদ্বয়কে উপস্থিত করা হলে তিনি তাদেরকে তাওরাত কিতাব আনতে বলেন এবং তা পাঠ করিয়ে শোনেন, অতপর তাদের উপরোক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেন। উল্লেখ্য যে, তাওরাত কিতাবেও যেনার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। বর্তমান বাইবেলেও এই আইনটি বিদ্যমান আছে।

মাদক গ্রহণ জনিত অপরাধের দণ্ড মুসলিম নাগরিকগণের উপর কার্যকর হয়। এই দণ্ড থেকে অমুসলিমদেরকে রেহাই দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মাদক গ্রহণ মুসলমানদের বেলায় হারাম ও দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও তা অমুসলিমদের জন্য বৈধ এবং তাদের ক্ষেত্রে অপরাধ নয়[১]। তবে তারা মাদকাসক্ত হয়ে অপরাধকর্মে লিপ্ত হলে উক্ত অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে।

মানবজীবন ও মানবদেহের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের শাস্তি (কিসাস) মুসলিম ও অমুসলিম সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ কোন মুসলিম নাগরিক কোন অমুসলিমকে হত্যা করলে বা তাদের দেহের ক্ষতিসাধন করলে অথবা কোন অমুসলিম কোন মুসলিম নাগরিকের বিরুদ্ধে অনুরূপ অপরাধ কর্ম করলে উভয়ের বেলায় ইসলামী আইন প্রযোজ্য হবে।

রসূলুল্লাহ স. এর যুগে জনৈক মুসলিম ব্যক্তি জনৈক অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন এবং বলেন, 'যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই।'[২]

উমর ফারুক রা. এর আমলে বাক্‌র ইব্‌ন ওয়াইল গোত্রের এক মুসলিম ব্যক্তি হিরাবাসী জনৈক অমুসলিমকে হত্যা করলে উমর রা. অপরাধীকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের নিকট সমর্পণ করার নির্দেশ দেন এবং তারা তাকে হত্যা করে।[৩]

উসমান রা. এর আমলে উমর ফারুক রা. এর পুত্র উবায়দুল্লাহ্ পিতৃ হত্যার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে হুরমুযান ও আবু লুলুর কন্যাকে হত্যা করেন। উক্ত অপরাধে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।

এসব কারণে ফকীহ্গণ এই বিধি প্রণয়ন করেন যে, কোন অমুসলিম কোন মুসলিম নাগরিক কর্তৃক ভুলবশত নিহত হলে তার ওয়ারিসগণকে ভুলবশত হত্যার পূর্ণ দিয়াত (রক্তপণ) সোপর্দ করতে হবে।[৪]

ইসলামের দেওয়ানী আইনও মুসলিম ও অমুসলিম সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। সম্পত্তি অর্জন ও রক্ষার ক্ষেত্রে অমুসলিমগণ পূর্ণরূপে ইসলামের দেওয়ানী আইনের অধীন। এই আইনের অধীনে মুসলমানদের উপর যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় তা অমুসলিমদের উপরও বর্তাবে। যেসব অধিকার সৃষ্টি হয় তাও তারা সমভাবে ভোগ করবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেনে যেসব উপায় ও পন্থা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ তা অমুসলিমদের জন্যও নিষিদ্ধ। তবে অমুসলিমরা নিজেদের মধ্যে শূকর ও মদের ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে এবং তা আহারও করতে পারবে।[৫] কোন মুসলিম ব্যক্তি তাদের ঐসব সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।[৬] মুসলমানদের ব্যবসায়ের অনুরূপ তাদের ব্যবসায়ও করারোপযোগ্য।

অমুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড এবং তাদের পারিবারিক কর্মকাণ্ড যেমন বিবাহ, তালাক, দেবত্তর সম্পত্তি দান, ওয়ারিসী স্বত্ব বণ্টন ইত্যাকার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিধান প্রযোজ্য হবে। সেসব ক্ষেত্রে তাদের উপর ইসলামী আইন প্রযোজ্য নয়। ইসলামী ধর্মমতে কোন জিনিস হালাল বা হারাম হলে এবং তা তাদের ধর্মমতে পর্যায়ক্রমে হারাম বা হালাল হলে সেক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় বিধানই কার্যকর হবে।

খোলাফায়ে রাশেদা ও তৎপরবর্তী সকল যুগে উপরোক্ত নীতিই কার্যকর ছিল। উমায়্যা খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয র. হাসান বসরী র. কে জিজ্ঞেস করেন, 'খোলাফায়ে রাশেদীন অমুসলিমদের নিষিদ্ধ (মাহ্রাম) নারীর সাথে বিবাহ, মদ ও শূকরের ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দিলেন কিভাবে?' হাসান বসরী র. উত্তরে লিখে পাঠান, তারা জিয্য়া দিতে এজন্যই তো সম্মত হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করার সুযোগ দিতে হবে। আপনার কর্তব্য পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি অনুসরণ করা, নতুন পদ্ধতি চালু করা নয়।'

তবে অমুসলিমরা এসব ব্যাপারে ইসলামী আইন অনুসারে ফয়সালা প্রার্থনা করলে সেই অবস্থায় ইসলামী আইন অনুযায়ী ফয়সালা হবে। তাছাড়া পারিবারিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের এক পক্ষ মুসলিম এবং অপর পক্ষ অমুসলিম হলে সেই অবস্থায় ইসলামী আইন অনুসারে ফয়সালা হবে। যেমন কোন খৃস্টান মহিলার স্বামী মুসলমান। স্বামী মারা গেলে উক্ত মহিলাকে ইসলামী আইন মোতাবেক ইদ্দত পালন করতে হবে এবং ইদ্দতকালের মধ্যে সে পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে না। সে পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হলে তা বাতিল অর্থাৎ আইনত অকার্যকর গণ্য হবে।[৭]

ইসলামের সমরবিধি মুসলমানদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে কোন সক্ষম মুসলমান প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইসলামী সরকারের সামরিক বাহিনীতে যোগদান করতে বাধ্য। কিন্তু অমুসলিমদের বেলায় এই আইন অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ তারা ইচ্ছা করলে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে নাও করতে পারে। তারা সামরিক বাহিনীতে যোগদান করলে অবশ্য মুসলমানদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।

সংবিধান মোতাবেক অমুসলিমগণ ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্ণ নাগরিক। কোনো কারণে তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা যাবে না। তারা যদি স্বেচ্ছায় ভিন্ন দেশে চলে যেতে চায় তাহলে তাদের বাধা দেয়া যাবে না। যদি তারা অপরাধ করে, এমনকি বিদ্রোহও করে, তবে তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া যাবে কিন্তু নাগরিকত্ব বাতিল করা যাবে না।

উমায়্যা খলীফা ওয়ালীদ ইবনে ইয়াযীদ রোমক বাহিনীর আক্রমণের ভয়ে সাইপ্রাসের অমুসলিমদের সেখান থেকে বহিষ্কার করে সিরিয়ায় পুনর্বাসিত করেন। এতে ফকীহগণ এবং মুসলিম জনসাধারণ ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং তারা এই দেশান্তরকরণকে একটা মারাত্মক গুনাহ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। অতপর ওয়ালীদ ইবনে ইয়াযীদ পুনরায় তাদেরকে সাইপ্রাসে নিজ বসতিতে পুনর্বাসিত করলে তার প্রশংসা করা হয় এবং বলা হয়, এটাই ন্যায়বিচারের দাবী।[৮]
লেবাননের পার্বত্য এলাকার একটি অমুসলিম গোষ্ঠী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাদের দমনের জন্য সালেহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ একটি সামরিক বাহিনী পাঠান। সে অভিযানের ফলে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সশস্ত্র সকল পুরুষ লোক নিহত হয় এবং অবশিষ্ট কতককে দেশান্তরিত করা হয়, আর কতককে স্বএলাকায় বহাল রাখা হয়। ইমাম আওযাই র. এই জুলুমের জন্য সালেহকে তিরস্কার করে একটি পত্র লিখেন এবং তাতে বলেন, 'আমি বুঝি না, কতক বিশেষ অপরাধীর অপরাধ কর্মের শাস্তি সাধারণ মানুষকে কিভাবে দেয়া যায় এবং তাদের সহায়-সম্পত্তি থেকে তাদের কিভাবে উৎখাত করা যায়? অথচ আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট নির্দেশ এই যে, 'একজনের পাপের বোঝা অপরজন বহন করবে না।'[৯] এটি অবশ্য পালনীয় একটি নির্দেশ। তোমার জন্য আমার সর্বোত্তম উপদেশ এই যে, তুমি রসূলুল্লাহ স. এর নিম্নোক্ত বাণী মনে রেখো, 'যে ব্যক্তি কোন অমুসলিমের উপর জুলুম করবে এবং তার সামর্থ্যের অধিক তার উপর বোঝা চাপাবে, তার বিরুদ্ধে আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো।'[১০]
'হুদূদ' ও 'কিসাস' বহির্ভূত ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল অপরাধ তাযীরের আওতাভুক্ত। এতে বিচারক তার সুবিবেচনা মোতাবেক শাস্তির ব্যবস্থা করেন। আর্থিক দুর্নীতি, প্রশাসনিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরোধী তৎপরতা, উৎকোচ আদান-প্রদান, সুদের আদান-প্রদান, জালিয়াতি, কালোবাজারি, অপরের সম্পদ হরণ বা বিনষ্টকরণ, অপরের অধিকার ও সম্মানে হস্তক্ষেপ ইত্যাকার যাবতীয় অপরাধ তাযীরের আওতাধীন। মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল অপরাধী সমভাবে তাযীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে।
কোন অমুসলিম নাগরিক নিজ ধর্ম ত্যাগ করলে বা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করলে সে ইসলামী আইনের অধীনে কোন অপরাধ করেনি বলে বিবেচিত হবে এবং তাই তার উপর ধর্মত্যাগের শাস্তি প্রযোজ্য নয়। ধর্মত্যাগের শাস্তি কেবল দীন ইসলাম গ্রহণ করে তা বর্জন করার ক্ষেত্রেই সীমিত।

তথ্যপঞ্জি

১. আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ২০৮-২০৯; ইমাম সারাখসী, আল-মাবসূত, ৯ খ., পৃ. ৫৭-৫৮।
২. ইনায়া শারহুল হিদায়া, ৮খ., পৃ. ২৫৬-এর বরাতে ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, পৃ. ৩৯১।
৩. আল-বুরহান শারহুল মাওয়াহিবির রহমান, ৩ খ., পৃ. ২৮৭-এর বরাতে ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, পৃ. ৩৯১।
৪. দুররুল মুখতার, ৩ খ., পৃ. ২০৩-এর বরাতে ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, পৃ. ৩৯১।
৫. আল-মাবসূত, ১৩ খ., পৃ. ৩৭-৩৮।
৬. দুররুল মুখতার, ৩খ., পৃ. ২৭৩-৭৪।
৭. আল-মাবসূত, ৫ খ., পৃ. ৩৮-৪১।
৮. ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ১৫৬।
৯. আল-কুরআন ৬ঃ১৬৪, ১৭ঃ১৫, ৩৫ঃ১৮, ৩৯ঃ৭, ৫৩ঃ৩৮।
১০. ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ১৬৯।

–মুহাম্মদ মূসা

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, পৃষ্ঠা : ৯-২২

ইসলামী আইনে নারী ও পুরুষের অধিকার

প্রফেসর ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম

নারী ও পুরুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি। উভয়ই একই পিতা ও একই মাতার সন্তান। উভয়ই একই প্রভুর দাস এবং একই প্রভুর খলিফা বা প্রতিনিধি। অতএব দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে উভয়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও মর্যাদা সমান। সমকাজের জন্য সম পুরস্কার প্রাপ্ত এবং সম শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রেও উভয়েই সমান। সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও উভয়ের অধিকার স্বীকৃত। প্রাপ্ত বয়স্ক হলে উভয়েই নিজ পছন্দমত বিবাহকরণ ও বর্জনেরও অধিকারী, শিক্ষা লাভের ও বিতরণের ক্ষেত্রে উভয়েরই অধিকার স্বীকৃত। সন্তান ধারণ, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব অর্জনের ক্ষেত্রেও উভয়ের অধিকার স্বীকৃত। তবে অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে নয়, বরং অধিকারের মাত্রাগত ক্ষেত্রে ইসলামী আইনে নারী ও পুরুষ ভেদে কিছুটা তারতম্য আছে। কোন ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর চেয়ে সম্মান, মর্যাদা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে একটু বেশি অধিকারী আবার কোন ক্ষেত্রে নারী একটু বেশি। এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ শক্তি সামর্থ ও কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে উভয়ের দায়িত্ব এক রকম নয়। এ তারতম্যকে পুঁজি করে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী একশ্রেণীর মানুষ নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের লক্ষে আন্দোলনে নেমেছেন। তাদের আন্দোলনের মাত্রা অতটাই বেগবান যতটা না তারা তাদের স্ব স্ব সরকারের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত তার চেয়ে ঢের বেশি ইসলাম ও ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে। যেমন বাংলাদেশের একজন নারী মুক্তি আন্দোলন নেত্রী নারী-পুরুষের সম্পত্তি প্রাপ্তির অসমতাকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন,[১] 'আমাদের আল্লাহ মিয়ার অংক জ্ঞান একটু কম আছে।' এর দ্বারা আন্দোলনকারীদের ক্ষোভ ও ইসলামী আইন সম্পর্কে জ্ঞানের মাত্রা বুঝা যায়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সংক্ষেপে হলেও শুধু নারী নয় পুরুষেরও ইসলামী আইনে কি কি অধিকার স্বীকৃত আছে তা আলোচনা হওয়া দরকার। যদিও এখানে দীর্ঘ আলোচনা দরকার তবে এ প্রবন্ধে যে বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে তা হলো ঃ অধিকারের ধারণা, নারী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত তথ্য, নারী ও পুরুষের মর্যাদা ও অধিকার, নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন সম্পর্কে অভিযোগ ও তার জবাব এবং স্বীকৃত অধিকারসমূহ অর্জনের উপায়।

লেখক : বর্তমানে বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদের ডীন। ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান, আইন বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এবং ভূতপূর্ব পরিচালক, এলএলএম প্রোগ্রাম, সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় । তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ায় পড়াশুনা করেন। তারপর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১৩ বছর অধ্যাপনা করেন।

অধিকারের ধারণা : প্রেক্ষিত নারী ও পুরুষ

অধিকার (Right) অর্থ হলো সত্য, ন্যায়, সরল, সহজ, ধার্মিকতা, ন্যায়পরায়ণতা, সঠিক আচরণ বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, চিন্তার স্বচ্ছতা, বর্ণনা বা কর্ম, যথাযথ, শক্তি (Power), সুযোগ (Previlege) কোন বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত দাবী ইত্যাদি।[২] স্যালমন্ডের মতে, অধিকার হচ্ছে এমন একটা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় যা আইন দ্বারা স্বীকৃত এবং সুরক্ষিত।[৩] এর আরবী তথা ইসলামী শব্দ হচ্ছে হক (haq) যার অর্থ হচ্ছে ঃ কোন প্রতিষ্ঠিত ঘটনা, সত্য, বাস্তবতা।[৪]

অধিকারের উৎপত্তি

বিভিন্ন School of Thought অধিকারের উৎপত্তি বা উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ধারণা পেশ করেছে। যেমন সোশালজিস্টদের মতে মানুষ প্রথমে দলবদ্ধভাবে কৃষিজ অঞ্চলে বসবাস করতো। এ সময়ে অধিকার সম্পর্কে তেমন ধারণা ছিল না। কালক্রমে কর্মের অন্বেষণে শহরে আসে। প্রয়োজনের তাগিদে অধিকারের ধারণা সৃষ্টি হয়। লিও স্ট্রাক-এর মতে মানুষের অধিকার সমাজেরই সৃষ্টি, অর্থাৎ কোন সমাজে কোন কর্ম বা আচরণ দীর্ঘদিন যাবৎ চলতে থাকলে কালক্রমে তা মানুষের অধিকারে পরিণত হয়।[৫] মানুষের আচরণের শক্তি সম্পর্কে কলসুনের অভিমত হচ্ছে ঃ

'The tribes were bound by the body of unwritten rules which had evoloved along with a historical growth of the tribes itself as the manifestation of their spirit and character which guaranted certain rights, neither the tribal sheikh nor any representative assembly had legislative power to interfere with this sytem.'[৬]

লিও স্ট্রাক বলেন, 'Many people tody have adopted the view that standard right is nothing but the ideal adopted by our society and civilization.'[৭]

পজিটিভিষ্ট স্কুল অফ ল' এর মতে আইন হচ্ছে বিচার বিবেচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নেতৃস্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিধিমালা। অর্থাৎ বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন প্রণেতাগণ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন বিধি বিধানের উপর বৈধতা দান করেন তা আইন হিসেবে স্বীকৃত। এ জাতীয় বিষয়ে আইন প্রণেতার ইচ্ছাই আইন (Law is the will of the law makers)। এ ক্ষেত্রে একে হতে হবে ধর্মীয় ও নীতি নৈতিকতা মুক্ত। পজিটিভ আইন মূলত ন্যাচারাল আইনকে বর্জনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়।[৮] ধর্ম কি বললো, নৈতিকতা কি বললো, Positivist-দের নিকট এর কোন মূল্য নেই। তাদের নিকট মূল্য হলো সমাজ কি চায়– সমাজ প্রতিনিধিরা এতে সম্মত কি না। যেমন ঃ সমকামিতা ও সমকামীদের মধ্যকার বিবাহ বন্ধন। এ বিষয়ে ধর্মীয় ও নৈতিকতার দৃষ্টি কি তা তাদের বিবেচ্য নয়, বরং তারা দেখেন ব্যাপক জনগোষ্ঠী সমকামী কি না? সমকামীদের মাঝে বিবাহ বন্ধনে তারা পরস্পর আগ্রহী কি না? যদি এর চর্চার ব্যাপকতা ও গ্রহণযোগ্যতা দেখা

যায় তাহলে হয় সমকামীদের দাবীর প্রেক্ষিতে অথবা আইন প্রণেতাগণ সমকামীদের স্বার্থ সংরক্ষণে নিজের উদ্যোগেই একে আইন পরিষদে পাঠাবে এর আইনী স্বীকৃতির জন্য। যখনই এর স্বীকৃতি পাওয়া যাবে তখনই তা আইনের মর্যাদা লাভ করবে। পজিটিভিষ্টদের এ মতামত সম্পর্কে ফ্রিডম্যান বলেন, 'It is (Positive theory of Law) is divorced from justice instead of being based on ideas of good and bad, are based on the Power of superior. This is a transfer of the authourity of God to human being.[৯]

ইসলামী ধারণা

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইসলামে মানুষের কোন অধিকার আছে তাও স্বীকার করতে রাজি নয়। কারণ তা স্বীকার করার অর্থ হলো ইসলামী দর্শনের স্বীকৃতি। যেমন হেনরী সিগমান বলেন, 'Here is no such abstruction as individual right could have been existed in Islam. What he has only obligations.'[১০]

উদ্দেশ্য প্রণোদিত এ বক্তব্যকে যুক্তিহীন ও তথ্যহীন প্রমাণ করে কতিপয় মুসলিম চিন্তাবিদ এর জবাব দিয়েছেন। যেমন জাতিসংঘে ওমানি প্রতিনিধি এম. মাক্কী বলেন, 'The basic concept and principles of (human) rights have from the begining, been embodied in Islamic Law.'[১১] সাইয়েদ মওদূদী এ বিষয়ে লিখেন, Islamic concept of fundamental rights are so practical, which 1400 years ago Islam gave to men, even to those who were at war with each other and to the citizen of it's state.[১২]

মুসলিম চিন্তাবিদদের উপরোক্ত বক্তব্য মূলত পবিত্র কুরআনে অধিকারের সূত্র সংক্রান্ত বিষয়েরই প্রতিধ্বনি। ইসলামী ধারণায় আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা, প্রভু এবং তিনিই আইনদাতা, বিধানদাতা। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত দেবেন। কোনটি অধিকার আর কোনটি নয়, কতটুকুন অধিকার দেবেন, কাকে দেবেন আর কাকে দেবেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, হক বা অধিকার আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।[১৩] একে আরো সুস্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ্ বলেন, হক বা অধিকার আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে-এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ কর না।[১৪]

অবস্থা যখন এমন যে, ইসলামী আইনে অধিকারের সূত্র হচ্ছেন স্বয়ং মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ্ নিজেই তাহলে নারীর অধিকার ও পুরুষের অধিকারের সূত্রও তিনি। এ ব্যাপারে অভিযোগ থাকলে তা হতে হবে স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে। অমুসলিম পণ্ডিতবর্গ যেহেতু ইসলামে বিশ্বাসী নন অতএব তাদের আল্লাহকে অধিকারের সূত্র না মানাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে যত রকমের কথা বা অভিযোগই তারা পেশ করেন না কেন তা হবে সত্যের বিপরীত।

কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে মুসলিম নামধারী পণ্ডিতদের বক্তব্য নিয়ে। ইসলামী আইন, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী আইন ও অধিকারের উৎস এসব বিষয়ে তারা ইসলামের নিকট না এসে, কুরআন-

সুন্নাহর নিকট না এসে তারা যান Non-Muslim schools of Thoght-এর পণ্ডিতদের নিকট। সেখান থেকে যা পান একে মূল সূত্র ও তথ্য জ্ঞান করে সে আলোকেই চিন্তার জগতে বিচরণ করতে চান। এ জাতীয় মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই মুসলিম সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, আইনবিদদের বিরাট অংশ ইসলামী জীবন দর্শনের স্থলে বস্তুবাদ প্রদত্ত সেক্যুলার পদ্ধতিকে জীবনে চলার প্রধান পথ হিসেবে গ্রহণ করে চলছেন। এটা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এমনকি ইসলাম বৈরিতারও শামিল। এ অজ্ঞতা ও বৈরিতাই নারী মুক্তি আন্দোলনে ইন্ধন যোগায় মুসলিম বিশ্বে। আর পাশ্চাত্যেই মূলত এ আন্দোলনের সূত্রপাত। তাদের আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল নারীর মনুষ্যত্বের স্বীকৃতির জন্যই। তারা সফল হয়েছে নারীর মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি আদায়ে তবে এমন স্বাধীনতা তাদের নারীদের দেয়া হলো যার ফলে তারা পুরুষের ভোগের পাত্র হিসেবেই গণ্য হতে থাকলো স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জনের নামে। যোগ-বিয়োগ শেষে আজ পাশ্চাত্যের নারীরাই পুনরায় বৈধ দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠছে।

নারীবাদী আন্দোলনকারীদের এ বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে হবে যে, নারী ও পুরুষ সম্পর্কে ইসলামী ধারণা ও পাশ্চাত্য ধারণা এক নয়। ইসলাম মানুষকে তার খলিফার মর্যাদা দিয়েছে। খলিফা বা প্রতিনিধির যে মর্যাদা থাকা দরকার, যে অধিকার থাকা দরকার ইসলাম সেভাবেই তা দিয়েছে। অথচ পাশ্চাত্য দর্শনের প্রবক্তারা কেউ কেউ মানুষকে স্রষ্টার সন্তান মনে করে,[১৫] কেউ মানুষকে বন্য পশুরই একটি উন্নত জাত মনে করে। নারীদের ব্যাপারে এ বস্তুবাদী দর্শনের ধারণা একেবারেই ন্যাক্কারজনক। যেমন এথেনিয়ান সভ্যতা নারীকে সব সময়েই মাইনর (minor) ভেবে পুরুষের অধীনস্ত মনে করতো। রোমানরা নারীদের বেবী (babe) minor, ward এবং এমন একটা সত্তা মনে করতো যার নিজের ইচ্ছা, রুচি এবং স্বাধীনতা অনুযায়ী কাজ করার কোনই ক্ষমতা নেই। যাকে সব সময় স্বামী বা অন্য কোন পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হতো। স্ক্যানডিনিভিয়া সম্প্রদায় নারীকে বিবাহিত আর অবিবাহিত যাই হোক, চিরস্থায়ীভাবে পুরুষের অভিভাবকত্বের অধীন বলে মনে করতো। বৃটিশ কমন ল'তে নারীর পৃথক কোন সত্তার স্বীকৃতি ছিল না। এমন কি বিয়ের সময় সে যে সম্পদ পেত তাও স্বামীর মালিকানায় চলে যেতো। হিন্দু ধর্মে নারীর কোন সম্পত্তির অধিকার আজও স্বীকৃত নয়।[১৬] স্বামীর মৃত্যুতে তার বেঁচে থাকার অধিকারেরও স্বীকৃতি ছিল না। জ্বলন্ত আগুনে তাকে জোর করে ফেলে দেয়া হতো। আজও হিন্দু সমাজসহ পৃথিবীর দেশে দেশে গর্ভপাতের মাধ্যমে নারীর আগমনকে রহিত করা হচ্ছে। গত বিশ বছর শুধু ভারতেই এ জাতীয় এক কোটি গর্ভপাত করানো হয়েছে বলে খবর বেরিয়েছে।[১৭] ইসলাম রয়েছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে। ইসলামের দৃষ্টিতে ছেলে-মেয়ে শুধু সমানই নয়, বরং কন্যা সন্তানের আগমন পিতা-মাতার জন্য পরকালেও জান্নাত লাভের উপায় বলা হয়েছে।

নারীমুক্তি আন্দোলন : এর প্রাসঙ্গিকতা

সমসাময়িক নারীমুক্তি আন্দোলন শুরু হয় ১৮৪৮ সালে পশ্চিমা বিশ্বে। এ আন্দোলন ছিল নারীর মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য। এ দাবীর সাফল্য অর্জনের পর ১৯৬০ এর দশকে তারা দাবী

জানায় নারী-পুরুষের সম অধিকারের। পরবর্তীতে তারা দাবী জানায় নারী স্বাধীনতার। তাদের প্রত্যাশিত অধিকার তারা পেল বটে তবে এজন্য হারাতে হলো সতীত্ব, নারীত্ব ও মাতৃত্ব। এতে বিশ্বব্যাপী পারিবারিক ব্যবস্থায় ধস নামার ফলে আইন করে homosexualism, lesbianism এবং live together-কে আইনী স্বীকৃতি দিতে হলো।[১৪] বর্তমান আন্দোলন হলো নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর এ অধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘ ১৯৫২ সালে ঘোষণা করে Convention on Political Rights of Women, ১৯৬৭ সালে ঘোষণা করে Declaration on Elimination of Discrimination against Women এবং ১৯৭৯ সালে ঘোষণা করে Eumination of all forms of Discrimination against women.[১৯] অত কিছুর পরও নারীরা তাদের নিরাপদ মনে করছে না। পুরুষরা যেমন আক্রমণাত্মক হয়েছে নারীরা হয়েছে তারও বেশি। বাধ্য হয়ে পশ্চিমা বিশ্বে স্ত্রীর নির্যাতন 'থেকে' স্বামী রক্ষা সমিতি করতে হয়েছে পুরুষদের। শেষ পর্যন্ত সকল কুল সাঁতরিয়ে ঐসব নারী পুনরায় নিজেদেরকে গৃহমুখী করার লক্ষে মতামত পেশ করতে শুরু করেছে। নারী মুক্তি আন্দোলনের লীলা ভূমিতেই যখন এ আন্দোলনের এ দশা, এর জন্মস্থলে যখন তা বিপরীতমুখী, ঠিক এ সময়ে প্রতীচ্যের বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের নারীরা নেমেছে সে আন্দোলনে। এটা আন্দোলনকারীদের দৈন্যদশারই প্রতিফলন। কারণ তারা Outdated, backwarted of information and action.

পশ্চিমা বিশ্বে নারী আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল সময় ও পরিস্থিতির দাবী। তাদের আন্দোলনে নারীত্বের প্রাপ্তির চেয়ে বিসর্জন অনেক বেশি। পক্ষান্তরে ইসলামী সমাজে নারী অধিকারের জন্য কোন আন্দোলন করতে হয়নি। আল্লাহ্ নিজেই সকলের স্ব স্ব অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর আইনের অনুসারী শাসক নবী স. এবং তাঁর পরবর্তী শাসকগণ তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। মুসলিম শাসন তার ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা হারানোর ফলে নারীরাও পুরুষের মতই তাদের কিছু অধিকার হারিয়েছে। কিন্তু এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, হারানোর পরও মুসলিম নারীরা অনৈসলামী শাসনেও যে অধিকার ভোগ করছে তা পাশ্চাত্য নারীদের চেয়ে শত গুণে বেশি। আর মুসলিম নারীরা যে অধিকার বঞ্চিত হয়েছে বলে দাবী করা হয় তা ধর্মীয় বা সামাজিক কারণে নয়, বরং তা হচ্ছে মুসলিম সমাজ ধর্মনিরপেক্ষ বা ভোগবাদী দর্শনে পরিচালিত হওয়ার কারণে।

বাংলাদেশসহ সারা মুসলিম বিশ্বে এক শ্রেণীর নারী তাদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করছেন। এদের এক শ্রেণীকে পরিচালনা করছেন ধর্মনিরপেক্ষবাদী গ্রুপ, আর একদল পরিচালিত হচ্ছেন কতিপয় ইসলামী ভাবধারার পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবী দ্বারা। প্রথম গ্রুপ ভ্রান্ত ধারণায় তাড়িত আর দ্বিতীয় গ্রুপের ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে। কারণ এ গ্রুপটি যতটা না কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত তার চেয়ে বেশি তাড়িত বিবেক বুদ্ধিজনিত মতবাদে। দ্বিতীয় গ্রুপের হাত থেকে মুসলিম নারী সমাজকে বাঁচাতে হলে সঠিক ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আন্দোলনের মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত নেতৃবৃন্দকে নারী আন্দোলনের মূল ধারা রক্ষার্থে সম্পৃক্ত

নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে ইসলামী গ্রুপের নারীরাও ইসলাম বিরোধী না হলেও ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন।[২০]

ইসলামী আইনে নারী ও পুরুষের মর্যাদা ও অবস্থান

নারী ও পুরুষ উভয়ই এক আল্লাহর সৃষ্টি এবং একই পিতা-মাতার সন্তান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখান থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন।[২১]

নারী ও পুরুষ এরা পরস্পরের বন্ধু (দাস নয়-অধীনস্ত নয়)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'ভাল আমল বা কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রেও উভয়ের অধিকার সমান।[২২] পবিত্র কুরআন বলছে, শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষের অধিকার সমানভাবে স্বীকৃত। পবিত্র কুরআনের প্রথম বাক্যই হলো জ্ঞান অর্জন সংক্রান্ত। আর এ জ্ঞান অর্জন নারী ও পুরুষ সকলের জন্য।[২৩] এ প্রসঙ্গে মহানবী স. এর ফরমান আরও শক্তিশালী। তিনি বলেন, জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই বাধ্যতামূলক।[২৪]

সমান কাজের জন্য সমান পুরস্কার রয়েছে নারী ও পুরুষের উভয়ের জন্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চিতভাবে মুসলিম নারী ও পুরুষ, ঈমানদার নারী ও পুরুষ, অনুগত নারী ও পুরুষ, সত্যবাদী নারী ও পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী ও পুরুষ, বিনীত নারী ও পুরুষ, দানশীল নারী ও পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী ও পুরুষ, যৌন হেফাজতকারী নারী ও পুরুষ, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী নারী ও পুরুষ, সকলের জন্যই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে সমান ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের।[১৫]

সন্তানদের পক্ষ থেকে পিতা-মাতা (নারী-পুরুষ) উভয়ের সমান মর্যাদা পাওয়ার এবং ভরণ পোষণ পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে ঃ

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত কর না। আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাদের মধ্যে একজন অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং ধমকের স্বরে কথা বলো না, বরং তাদের সাথে মধুর ভাষায় কথা বল। তাদের সাথে ভালবাসার শব্দ প্রয়োগ কর, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং প্রার্থনা কর, হে আমার পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি এমন সদয় হও যেমনটা তারা ছিলেন আমাদের প্রতি আমাদের বাল্যকালে।[২৬]

অধিকারের উৎস এবং সূত্র স্বয়ং আল্লাহ। কাকে দেবেন, কতটুকু দেবেন এটা তাঁর এখতিয়ার। অধিকারের উৎস সম্পর্কে তিনি বলেন, অধিকার আসে তোমার রবের পক্ষ থেকে। অতএব এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ কর না (২ঃ১৪৭)।' আল্লাহ নারী ও পুরুষ উভয়কেই পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে অংশিদারিত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, পিতা ও নিকটাত্মীয়গণ যা কিছু রেখে যায়, তা কম হোক বা বেশি হোক তাতে বাধ্যতামূলকভাবে নারীরও অংশ আছে পুরুষেরও আছে।[২৭] এ

অধিকার দানের ক্ষেত্রে আল্লাহ কারও প্রতি জুলুম করেন না।[২৮] তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ কোন বান্দার প্রতি জুলুম করেন না। (সূরা আনফাল-৫১)

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কতিপয় স্বীকৃত অধিকার

যে সব অধিকারকে মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার বলে ইসলাম এবং প্রচলিত আইন স্বীকৃতি দিয়েছে তা নারী ও পুরুষ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। ইসলামই শুধুমাত্র এ সব স্বীকৃত অধিকার নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য বলে ঘোষণা দিয়েছে, অন্য কোন ধর্ম বা দর্শন তা দিতে পারেনি। বর্তমানে প্রচলিত যে মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার এটা কোন ধর্মীয় দর্শনের ফল নয়, বরং positive Law এরই কৃতিত্ব। অথচ মানবতার প্রথম দিন থেকেই ইসলাম তার স্বীকৃতি দিয়ে ও প্রয়োগ করে আসছে।

positive Law এক্ষেত্রে ইসলামের নিকট দায়বদ্ধ তবে প্রচলিত মানবাধিকারের অনৈতিক দিকগুলো ইসলাম সমর্থিত নয়। নিম্নে ইসলামের স্বীকৃত অধিকারগুলোর ব্যাখ্যা এবং তথ্য ছাড়া শুধু নামগুলো পেশ করা হলো।

(১) জীবনের অধিকার (Right to life), (২) জীবন বাঁচানোর অধিকার, (৩) শিক্ষা গ্রহণের অধিকার, (৪) ধর্ম গ্রহণ, পালন ও প্রচারের অধিকার, (৫) সম্পত্তি অর্জন, ব্যবহার ও হস্তক্ষেপের অধিকার, (৬) মত প্রকাশের অধিকার, (৭) চলাফেরার অধিকার, (৮) সতীত্ব বজায় রাখার অধিকার, (৯) গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার, (১০) রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে অংশ নেয়ার অধিকার, (১১) প্রতিরক্ষায় অংশ নেয়ার অধিকার, (১২) বৈধ বিয়ের মাধ্যমে সংসার গঠনের অধিকার, (১৩) শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য সেবা পাবার অধিকার, (১৪) ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার, (১৫) অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নিরপরাধ গণ্য হওয়ার অধিকার, (১৬) সভা-সমিতি ও সংগঠন করার অধিকার, (১৭) রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার অধিকার, (১৮) মুক্ত পরিবেশে বাঁচার অধিকার, (১৯) আইনের চোখে সমান পরিগণিত হওয়ার অধিকার ইত্যাদি। উপরোক্ত অধিকারগুলোর স্বপক্ষে প্রচুর পরিমাণ দলিল প্রমাণ বিদ্যমান। এগুলো সংবিধানে মৌলিক এবং আন্তর্জাতিক আইনে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত।[২৯]

অধিকার ও দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে তারতম্য :

পুরুষের অধিকার ও মর্যাদা :

ঘরের বাইরের যাবতীয় কাজকর্ম আনজাম দেয়ার পূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে পুরুষের। সংসারের ভরণ পোষণের যোগান থেকে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার মত যাবতীয় কষ্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজও পুরুষেরই দায়িত্বের অংশ। পুরুষের এ মর্যাদা ও দায় দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, পুরুষেরা হচ্ছে নারীদের উপর দায়িত্বশীল। এভাবেই আল্লাহ একজনের উপর আর একজনকে মর্যাদা দিয়ে থাকেন।[৩০]

এ দায়িত্বের কারণে পুরুষকে জীবিকা উপার্জনের যাবতীয় ভূমিকা পালন এবং সংসার, সমাজ ও

রাষ্ট্র পরিচালনা ও রক্ষার জন্য যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হয়। পুরুষের উপর সংসার পরিচালনার মতো গুরুদায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই আল্লাহ তাআলা পিতার সম্পত্তিতে পুরুষের (ভাইয়ের) অধিকার বোনের চেয়ে দ্বিগুণ করেছেন। রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান কর্মকর্তার পদ পুরুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন। যদিও নারীর উক্ত পদে সমাসীন হওয়া অবৈধ নয়। নামাযের ইমামতির ক্ষেত্রে পুরুষের ইমামতিই অনুমোদন করেছেন। তবে নারীদের জামায়াতে নারীর ইমামতিও রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক অনুমোদিত। আদালতে সাক্ষ দানের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রবিশেষে দু'জন মহিলার স্থলে একজন পুরুষের সাক্ষী সমান বলে গণ্য করেছেন। যাবতীয় বিচারঃ ফয়সালা ব্যর্থ হলে এককভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছেন। এসব মর্যাদা ও অধিকারের দার্শনিক ভিত্তি ও গুরুত্ব বিবেচনায় দেখা যাবে যে, পুরুষের এ মর্যাদা ও অধিকার শুধু সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই নয় বরং তা নারীর কল্যাণের জন্যও একান্ত অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে বিকৃতি ঘটলে সমাজ ও রাষ্ট্রে যেমন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে এবং পরকালে দায়িত্ব অবহেলার কারণে আল্লাহর কাঠ গড়ায় জবাবদিহি করতে হবে। তবে এ জন্য নারীর কোন জবাবদিহিতা নেই। কারণ সমাজ রাষ্ট্র ও পরিবার পরিচালনার জন্য রোজগার তার মৌলিক দায়িত্বের অংশ নয়। এটা নারীর জন্য একটা বড় ধরনের দয়া রহমত।

নারীর বিশেষ মর্যাদা

পুরুষের যেমন বিশেষ মর্যাদা অবদান ও অধিকার স্বীকৃত তেমনি নারীর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। মানব বংশ রক্ষায় নারীর অবদান মহিমান্বিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। দু'বছর যাবত তাকে দুধ পান করিয়েছে।[৩১]

এ কষ্টকেই যেন আল্লাহ পুষিয়ে দিয়েছেন মায়ের পদতলে জান্নাতের ঘোষণা দানের মাধ্যমে। রসূল স. বলেন, তোমাদের মায়েদের পদতলে তোমাদের জান্নাত। এটা একটা যুগান্তকরী আইন। নারীর মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দলিল যা বিশ্বের কোন ধর্ম বা দর্শন দেয়া দূরের কথা, চিন্তাও করতে সক্ষম নয়। এটা মায়ের মর্যাদার Magna Carta। এ এক যুগান্তকারী চূড়ান্ত ঘোষণা। এর অর্থ হতে পারে মায়ের সন্তুষ্টি ছাড়া জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়। আর মা যদি নারী অর্থে ব্যবহৃত হন তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়: কোন জাতি তার নারী সমাজকে অসন্তুষ্ট রেখে জান্নাতে যেতে পারবে না। মায়ের মর্যাদা বুঝা যায় ঐ হাদীসটির মাধ্যমে যাতে রসূল স. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সন্তানের সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কার অধিকার বেশি। রসূল স. তিন তিন বারই বলেছিলেন, 'তোমার মা', চতুর্থবার বলেছিলেন, 'তোমার পিতা। অন্য এক বর্ণনায় রসূল স. বলেন, যে ব্যক্তি তার তিনজন কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করলো, সুশিক্ষা দিল ও সুপাত্রস্থ করলো সে ব্যক্তি আর আমি জান্নাতে এক সাথে অবস্থান করবো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যদি এর সংখ্যা দু'জন এবং একজন হয় তাতেও একই ফলাফল অর্জিত হবে? তিনি বলেন হ্যাঁ।[৩৩]

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসলিম পরিবারে মেয়ে সন্তানের আগমন দুঃখের নয় বরং সুখের। বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষকেই যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইসলামের বিধান হচ্ছে ঃ 'সন্তুষ্ট চিত্তে মহরানা দিয়ে তাদের (মেয়েদের) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর।[৩৪]
বর্তমানে স্বামীর কাছ থেকে নারীর প্রয়োজনীয় সবকিছু পাওয়ার স্থলে নারীর উল্টো স্বামীকে দিতে হয়। এটা ইসলামী আইন সমাজে প্রতিষ্ঠিত না থাকার ফল। কারণ নারীর এ অধিকার চিরধার্য। এটা তার একান্ত প্রাপ্য, মোহরানা পরিশোধ না করার অভিপ্রায় সম্পর্কে মহানবী বলেন, 'কোন ব্যক্তি মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ করলেন কিন্তু তা পরিশোধের ইচ্ছা নেই, সে যেনাকারী'।[৩৫]
ভরণ-পোষণের যোগান দান পুরুষেরই কাজ। এমন কি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে এবং স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী যদি চলে যেতে চায় ঐ অবস্থায়ও তিন মাসের জন্য ঐ স্ত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে স্বামী বা স্বামীর সম্পত্তি থেকে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে।[৩৬] অতীতে যেমন্ন কন্যা সন্তানকে আপদ মনে করে বিভিন্ন উপায়ে এমন কি জীবন্ত পুঁতে হত্যা করা হতো আজও তথাকথিত সভ্য সমাজে করা হয় অব্যাহত ভাবে কন্যা সন্তানের ভ্রূণ হত্যা। ইসলামী আইনে এটি কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং পরকালীন আদালতে নিহত ভ্রূণকে অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ দেয়া হবে। সে বলবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো।[৩৭] ইসলামের এ বিধান চিরন্তন-চির নতুন। যারা আজ abortion-এর মাধ্যমে এবং আরও বিবিধ অবৈধ পন্থায় মেয়ে সন্তানের আগমন রোধ করছে তারা শেষ বিচারের আদালতে মেয়ে হত্যার অভিযোগ এড়াতে পারবে কি? ইসলাম নারীকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে তা হলো স্বামী সম্পর্কে স্ত্রীর মতামত। রসূল স. বলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে তারা যারা তাদের স্ত্রীদের দৃষ্টিতে উত্তম।'[৩৮] রসূল স. ওহী পাওয়ার পর প্রথম একজন মহিলার নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় এক সংকটময় অবস্থার সময় তার একজন স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেন এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন, এ কয়েকটি তথ্যের মাধ্যমেই বুঝা যায় যে, ইসলামী আইনে নারীর মর্যাদা কত বেশি। বিদায় হজ্জে তিনি বিশেষভাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ রাখার তাকিদ দেন।

নারী অধিকারের ক্ষেত্রে আপত্তি ও কতিপয় অভিযোগ

বলা হয়ে থাকে যে, (১) জেনার ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থাই মহিলার শাস্তির জন্য সাক্ষী হিসেবে কাজ করবে। (২) মহিলা রাষ্ট্র প্রধান হতে পারবে না। (৩) সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে ভাইয়ের অর্ধেক পাবে। (৪) এককভাবে ডিভোর্স করতে বাধা। (৫) সাক্ষদানের ক্ষেত্রে ১ জন পুরুষ সমান দু'জন নারী। (৬) দিয়াতের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকার এক নয়।
জবাব ঃ (১) জেনার শাস্তি নারী ও পুরুষের উভয়ের জন্য সমান। আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে ঃ 'ব্যভিচারি নারী ও পুরুষ উভয়কে এক শত বেত্রাঘাত কর।[৩৭] তবে নারী যদি অন্তসত্ত্বা হয়ে থাকে তবে সন্তান প্রসবের পর উপযুক্ত সময়ে তাকে শাস্তি দিতে হবে। শাস্তিদানের ক্ষেত্রে যদি তা হুদুদ (fixed punishment) হয়ে থাকে তাহলে ৪ জন বিশ্বস্ত লোকের সাক্ষী দ্বারা তা প্রমাণিত হতে

হবে। বিষয়টা যদি এমন হয় যে, জেনাকারী পুরুষদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। অথবা তারা পলাতক– এ অবস্থায় অন্তসত্তা বা pregnancy জেনার সাক্ষী হিসেবে কাজ করবে। যদি নারী বা পুরুষের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে তা শাস্তিযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর আইন হচ্ছে ঃ

'অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি বাধ্য হয়ে এবং আল্লাহর আইন লংঘন করার সংকল্প না করে কোন অপরাধ করে তবে এতে কোন অপরাধ নেই।'[৪৮]

অন্তঃসত্তা স্বামীহীন মহিলার ক্ষেত্রে যেনার সন্দেহ সৃষ্টি করে মাত্র। অতএব, কোন মহিলা অন্তসত্তা হওয়ার পরও সে যদি প্রমাণ করতে পারে যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে যৌন কর্ম করতে বাধ্য করা হয়েছে– এক্ষেত্রে সে শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। এ জাতীয় কর্ম যুদ্ধের সময়ে এমনকি যুদ্ধ ছাড়াও সংঘটিত হতে পারে। সুতরাং এ কথা ঠিক নয় যে, অন্তসত্ত্বা হলেই শাস্তির কোন ব্যতিক্রম নেই।

২) রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান হিসেবে মহিলা ঃ পুরুষকে আল্লাহ্ নারীর ওপর কাওয়াম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাওয়াম এর অর্থ হলোঃ এমন শক্তির অধিকারী যিনি যথাযথ আচরণের জন্য দায়িত্ববান এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ। অতএব গৃহে তিনি গৃহকর্তা পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আর সরকারের ক্ষেত্রে সরকার প্রধান। রাষ্ট্র পরিচালনা একটা দায়িত্বপূর্ণ, জবাবদিহিমূলক এবং পরিশ্রম সাধ্য কাজ। এর জন্য নম্রতার সাথে সাথে কঠোরতারও প্রয়োজন। কূটনৈতিক ও সামরিক বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার এ ক্ষেত্রে কোন বিকল্প নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব হচ্ছে সেনা প্রধানের দায়িত্ব পালন করা এবং কেন্দ্রীয় মসজিদের নামাযের ইমামতি করা। এ দুটো কাজই নারীর জন্য মানানসই নয়। নারীর মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন তাকে এ সব কাজে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে। সামরিক কৌশল গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পুরুষ শাসিত বিশ্বে নারী অকপটে প্রতারিত হতে পারে, যার পরিণতি হবে ভয়াবহ। এজন্যই মহানবী স. বলেছেন, যে জাতি তার নারীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসায় সে জাতি কোনদিন সাফল্য অর্জন করতে পারবে না।[৪৯]

মহানবীর এ বক্তব্যের সত্যতা ও বাস্তবতার প্রমাণ হচ্ছেঃ যুগে যুগে আল্লাহ অসংখ্য নবী পাঠিয়েছেন এদের কেউই নারী ছিলেন না। যুগে যুগে ইসলামী শাসন বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এর কোথাও কোন নারীর প্রধান প্রশাসকের ভূমিকায় ছিলেন বলে দেখা যায় না।

'সাফল্য অর্জন করবে না' এতে সাফল্য বলতে বৈষয়িক সাফল্য এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাফল্য বুঝায়। নারী নেতৃত্বে বৈষয়িক কোন সাফল্য অর্জিত হলেও নৈতিক সাফল্য তাতে অর্জন করে জান্নাতমুখী হওয়ার বিষয়টি জটিল হয়ে পড়ে।

নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত এক প্রশ্নের জবাবে আল্লামা ইউসুফ আল কারদাভী বলেছিলেন, কুরআন ও হাদীসকে সামনে রাখলে ইসলামী আইনে নারীকে রাষ্ট্র প্রধানের পদে বসানোর অবকাশ

অবারিত নয়। তবে অবস্থা যদি এমন হয় যে, কোন রাষ্ট্রে সবাই মহিলা কোন পুরুষ নেই। অথবা পুরুষ থাকলেও Aids-এর মত দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগার কারণে কোন পুরুষকে রাজনৈতিক ময়দানে আনা সম্ভব না হয় এ অবস্থায় নারী ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকতে পারে না।

৩. সম্পত্তিতে মেয়ের অংশ ছেলের অর্ধেক ঃ পিতার সম্পত্তিতে বোনের পরিমাণ ভাইয়ের পরিমাণের অর্ধেকের বিষয়ে আল্লাহর আইন হচ্ছে, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, একজন পুরুষের (সম্পত্তির) অংশ দু'জন নারীর সমান। আর নারীই যদি হয় দু'য়ের অধিক তবে তাদের জন্য তিন ভাগের দু'ভাগ যা সে ত্যাগ করে যায়। আর যদি একজন হয় তাহলে সে পাবে অর্ধেক সম্পত্তি।'[৪১]

সাধারণ নিয়মে ভাইয়ের অর্ধেক, ক্ষেত্রবিশেষে পঁচাত্তর শতাংশ এবং পঞ্চাশ শতাংশ মেয়ে পায় তার বাপের থেকে। এছাড়া স্বামীর সম্পত্তিতে সাধারণ নিয়মে ১/৮ এবং ক্ষেত্র বিশেষে ১/৬ এবং ১/৪ অংশও পেয়ে থাকে। তদুপরি পেয়ে থাকে বিয়ের সময় বাধ্যতামূলক মহর (Dower) গহনাপাতি এবং স্বামীর সকল সম্পত্তি ও ভোগ বিলাসে অংশ নেয়ার চূড়ান্ত অধিকার। নারীর আয় করার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। তার কোন সম্পদ থাকলে এটা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তার সম্মতি ছাড়া এটা ভোগ করারও কারও অধিকার নেই। যে নারীর কোন অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব নেই, সংসার পরিচালনায় অর্থ যোগানোর কোন বাধ্যবাধকতা নেই এমন নারীকে ইসলাম এ পরিমাণ সম্পত্তির মালিকানা দিয়েছে যাকে সমসাময়িক বিশ্ব পূর্ণাঙ্গ মানুষই মনে করতো না– তার স্বাধীন আত্মা আছে কি না এ নিয়েও প্রশ্ন তুলত।

৪. দিয়াত (Blood money for Killing or injury) এর ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অসমতা ঃ নারী ও পুরুষ একই ফৌজদারী অপরাধের (Criminal offence) জন্য সম পরিমাণ শাস্তির যোগ্য। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। বরং কোন কোন আইনবিদ নারীকে এ ক্ষেত্রে লঘুদণ্ড দেয়ার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। শাস্তির সমতার ক্ষেত্রে কুরআনিক আইন হচ্ছে ঃ 'হে ঈমানদারগণ নরহত্যার (Homicide) ক্ষেত্রে আল্লাহতাআলা কিসাস (Retaliation)-এর ব্যবস্থা সংবিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, স্বাধীন ব্যক্তির জন্য স্বাধীন, গোলাম (Slave) এর জন্য গোলাম এবং নারীর জন্য নারীকে হত্যা করতে হবে।'[৪৩]

এ প্রসঙ্গে কুরআনের আর একটি বিধান হচ্ছে ঃ 'আমরা এ বিষয়ে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছি যে, জীবনের বদলে জীবন, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে, নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং আঘাতের পরিবর্তে আঘাত দানের মাধ্যমে রায় প্রদান করতে হবে।'[৪৪] (মায়েদা, ৫ : ৪৫)

ইসলামী আইনে এসব অপরাধের ক্ষেত্রে কুরআনের বিধান প্রযোজ্য। অপর কারো মতামত বা কোন Juristic opinion অকার্যকর। কুরআনের বিধান মতে দিয়াত ও কিসাসের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের শাস্তি সমান। সুতরাং উপরের বর্ণিত অভিযোগ সত্য নয়।

৫. নারী এককভাবে ডিভোর্স করতে পারে না ঃ এ কথা ঠিক নয়। Divorce একটি শরীয়ত অনুমোদিত অপসন্দীয় কাজ। এ অপসন্দের ভাগীদার হয়তো আল্লাহ নারীকে করতে চাননি। সে

যাই হোক, এ কথা ঠিক নয় যে নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার নেই। নারী স্বামীর নিকট ডিভোর্স চাইতে পারেন। একে বলে তালাকে তাফবীদ। অথবা পারস্পরিক বুঝা পড়ার মাধ্যমেও তা হতে পারে। একে বলে মুবারাত অথবা নারী আদালতে তালাক প্রার্থনা করতে পারে। একে বলে খুলআ।

৬. একজন পুরুষ দু'জন নারীর সাক্ষীর সমান ঃ এ কথা সব ক্ষেত্রে নয়। বরং নারীত্ব-মাতৃত্ব এ যাবতীয় ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষীই যথেষ্ট। সাক্ষী সংক্রান্ত কুরআনিক বিধানটি হচ্ছে ঃ 'তোমরা যখন লেনদেন করবে...... তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী করো। যদি দু'জন পুরুষ না হয় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে।' (সূরা ২ : ২৮২) এ ব্যবস্থা বিচারের বাদী ও বিবাদীর কল্যাণের জন্য প্রণীত। এটা মানুষের চিন্তা প্রসূত নয়, বরং নারী ও পুরুষের পালনকর্তা ও বিধানদাতা বিচার প্রার্থীদের কল্যাণের জন্যই এ বিধান করে দিয়েছেন। ক্ষেত্রবিশেষে বিচারক একজন নারীর সাক্ষে আশস্ত হলে তার ভিত্তিতে তিনি রায় দিতে পারেন। অতএব, এসব বিষয়ে প্রশ্ন তোলার অর্থ হলো, হয় ইসলামী আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা আর না হয় জেনে শুনে ইসলাম বিরোধিতার ভূমিকা পালন করা। কারণ ইসলাম বিরোধীরা ইসলামকে কাল্পনিক আতংক মনে করে।

প্রাপ্য অধিকার পাওয়ার উপায়

আইন ও অধিকার যতই সুন্দর হোক তা বাস্তবে প্রয়োগ না হলে এর কাঙ্ক্ষিত ফল ভোগ করা যায় না। নারী ও পুরুষকে দেয়া ইসলামের অধিকারগুলো তথা মানবাধিকারগুলোর উপকারভোগ থেকে নিজেদের দূরে রাখার কারণে মানব রচিত আইনে বঞ্চিতদের আক্রোশের শিকার ইসলামী আইন। যেখানেই ইসলাম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই মানুষ তার যাবতীয় অধিকার ভোগ করেছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে আজও যে গৃহে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা হয় সে গৃহের নারীরা সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা, মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করছেন- অনুরূপভাবে পুরুষরা পাচ্ছেন তাদের কৃত পরিশ্রমের মর্যাদা। অতএব প্রকৃত মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে হলে ইসলামের অনুশাসন জানার, মানার ও বাস্তবায়ন করার কোনই বিকল্প নেই।

শেষ কথা ঃ উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, ইসলামের আগমনের সাথে সাথে নারী ও পুরুষের অধিকার স্বীকৃত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। নারীর দায়িত্ব কম থাকার পরও যে অধিকার ও মর্যাদা তাকে দেয়া হয়েছে অধিকার পুরোপুরি প্রদান করতে গেলে হয়তো দেখা যাবে নারী মুক্তির স্থলে পুরুষ মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে। আর এর যাত্রা হয়তো শুরু হবে তাদের ঘর থেকেই যারা আজ নারীদের অধিকার আদায়ের নামে নারীদেরকে অমানবিক হতে ইন্ধন যোগাচ্ছেন। ইতিহাস সাক্ষী নারীর যে মর্যাদা ইসলাম দিয়েছে তা শুধু মৌখিক স্বীকৃতই ছিল না বাস্তবে তা ছিল কার্যকর। এ অধিকার পাওয়ার জন্য তাদেরকে যেমন আন্দোলন করতে হয়নি

তেমনি অধিকার ভোগের সময়েও এর যথার্থতা নিয়ে কোন কথা ওঠেনি বরং নারীরা ছিল সুখে, আর পুরুষরা ছিল খুশি। সুখী ও সুশৃংখল সমাজ গঠন করতে হলে পাশ্চাত্যের অনুকরণ ত্যাগ করে আমাদেরকে পূর্ণ ইসলামী আইনী ব্যবস্থাকেই গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

তথ্য সূত্র

১. মন্তব্যটি সাবেক সংসদ সদস্য বেগম ফরিদা রহমানের। ৯০ এর দশকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের এক সমাবেশে তিনি এ কথা বলেছিলেন। সে সময়কার পত্রিকার পাতা থেকে নেয়া।
২. ওয়েব স্টার New Twentiwth century Dictionary of English Language, 1979, 2nd Print 19th Rentce Hall prens.
৩. Longman's Dictionary of contemporary English, 1989, London, P. 898.
৪. আল মাসাদির আল মোয়াসসাসার বৈরুত, ১৯৯৪ পৃ: ১৬১।
৫. Light Donald, Sociology, Al Phed A. knop, Newyork, 1982, P. 40.
৬. Reol Coul Son, A History of Islamic Law, University press, Edenburgh, London. 1991, P. 10.
৭. Leo Stake, Natural Rights & History, The University of Chicago press, Chicago, 1970, P. 3.
৮. Hon's Kelsen, (1934-35), Pure Theory of Law. L.Q.R. vol. 50-51. quoted in Ilioyod's Jurispmdence. P. 350.
৯. Feildman, wlofgan Gaston, Legal Theory, steven and sons, London, 1967, P. 275-6.
১০. Henry Siesman, 1964, quoted in Muslim Quarterly.
১১. See the Report of Third committee of UN General Assembly. UN. 1979. UN Documents A/3/34/SR/27 NY.
১২. Mawdudi, Syed Abul Aa`la, Human Rights in Islam, Islamic Foundation, Deicester, 1982, P. 11.
১৩. আল কুরআন, আল বাকারা, ২ : ২৩।
১৪. আল কুরআন, আল বাকারা, ২ : ১৪৭।
১৫. আল কুরআন, আল বাকারা।
১৬. Ali, showkat, Human Rights in Islam, Adam Publication, Delhi, 1995, IP, 107-8.
১৭. দৈনিক সংগ্রাম, ১ জুন, ২০০৬, পৃ: ৯।
১৮. See UN Conference on Population Control held in Cairo in 1994.
১৯. See Convention on Political Rights of women 1952; Declaration of Elimination of Discrimination Against women 1979.
২০. বিভিন্ন মহিলা সংগঠন ইসলামের নাম দিয়েই ইসলামী অনুশাসনের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করছে। যেমন Malaysia-তে Sister in Islam আমেরিকায় Muslim women in America headed by DR Amina Wadud.

২১. আল কুরআন, আল নিসা, ৪ : ১।
২২. আল কুরআন, আল তাওবাহ, ৯ : ১৭১।
২৩. আল কুরআন, আলে ইমরান, ৩ : ১৯৫।
২৪. ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, বাব ১৭, নং ২২৪।
২৫. আল কুরআন, আল আহযাব, ৩৩ : ৩৫।
২৬. আল কুরআন, আল ইসরা ১৭ : ২৪-২৫।
২৭. আল কুরআন, আল নিসা, ৪ : ৫।
২৮. আল কুরআন, আল আনফাল, ৮ : ৫১।
২৯. বর্ণিত অধিকারগুলোর জন্য দেখুন : Islamic Constitution : Quranic and sunnatic Perspectives of DR. Alom. Mahbubul Ismam at 10th chapter. আরো দ্র. ইসলামে মানবাধিকার, আধুনিক প্রকাশনী।
৩০. আল কুরআন, আল নিসা, ৪ : ৩৪।
৩১. আল কুরআন, লোকমান, ৩১ : ১৪।
৩২. তিরমিযি, সুনান, কিতাবুল : বির আল ওয়ালেদাইন।
৩৩. রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খণ্ড।
৩৪. আল কুরআন, আল নিসা, ৪ : ৪।
৩৫. হাদীসটি ডঃ মোহাম্মদ গাজ্জালির মুসলিম ক্যারেকটার গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। এর নির্ভুলতা সম্পর্কে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
৩৬. আল কুরআন, আল তালাক, ৬৫ : ১।
৩৭. আল কুরআন, আল তাকাচ্ছুর, ৮১ : ৯।
৩৮. তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৯৪; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৭৭-৭৮; দারিমী, নিকাহ, নং ২২৬০।
৩৯. আল কুরআন, আল নূর, ২৪ : ২।
৪০. আল কুরআন, আল বাকারা, ২ : ১৭৩।
৪১. বোখারী, সহীহ, কিতাব; ওমারাহ।
৪২. আল কুরআন, আল নিসা, ৪ : ১১।
৪৩. আল কুরআন, আল বাকারা, ২ : ১৭৮।
৪৪. আল কুরআন, আল মায়েদা, ৫ : ৪৫।
৪৫. আল কুরআন, আল বাকারা, ২ : ২৮২।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, পৃষ্ঠা : ২৩-২৯

আল-কুরআনের আলোকে কৃপণতা : একটি আর্থ সামাজিক অপরাধ

জাফর আহমদ

'যারা আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদের বেলায় কৃপণতা প্রদর্শন করে তারা যেন এ ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত না থাকে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যে সম্পদের বেলায় তারা কৃপণতা প্রদর্শন করেছে সে সম্পদ কিয়ামতের দিন তাদের গলায় হার রূপে পরিয়ে দেয়া হবে।'(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮০)

কৃপণতার সংগা

আরবী ভাষায় 'বখিল' অর্থ কৃপণ। বুখল অর্থ কৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠতা বা অর্থ ব্যয়ে কাতরতা। আমাদের সমাজে বহুকাল থেকে আরবী বহুল প্রচলিত। যার দরুন বাংলা ক্রিয়ারূপে বখিলী বা 'বখিলতা' ব্যবহার হয়ে থাকে। বুখল বা কার্পণ্যের শরীয়ত নির্ধারিত অর্থ হল-'যা আল্লাহর রাহে ব্যয় করা কারো ওপর ওয়াজিব তা না করা।' এ কারণেই কার্পণ্য বা বুখল হারাম এবং এ জন্য আল কুরআনে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যে সব ব্যয় ওয়াজিবের আওতাভুক্ত নয়, সেসব ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য সাধারণ অর্থে তাকেও কার্পণ্য বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কার্পণ্য বা বুখল হারাম নয়। তবুও এটি উত্তমের পরিপন্থী অপসন্দনীয় অভ্যাস। বুখল বা কার্পণ্য অর্থেই আরও একটি শব্দ কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হলো 'শুহ্'। এর আভিধানিক অর্থ হলো ঃ কৃপণ হওয়া, কমে যাওয়া, লোভ করা ইত্যাদি। এ শব্দটিকে যখন নাফসুন শব্দের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে 'শুহ্হান নাফস' বলা হয় তখন তা দৃষ্টি ও মনের সংকীর্ণতা, পরশ্রীকাতরতা এবং মনের নীচতার সমার্থক হয়ে যায় যা বখিলী বা কৃপণতার চেয়েও ব্যাপক অর্থ বহন করে। এ বৈশিষ্টের অধিকারী ব্যক্তি অন্যের অধিকার স্বীকার করে না। সে চায় দুনিয়ার সবকিছু সে-ই লাভ করুক, অন্য কেউ যাতে কিছু না পায়। নিজে তো দান করেই না বরং সে অন্যের দান করাটাও পসন্দ বা সহ্য করতে পারে না। তার লালসার দৃষ্টি নিজ সম্পদের বাইরে অন্যের সম্পদের ওপর গিয়েও পড়ে। সে চায় চারদিকে যত ভাল বস্তু আছে তা সে দু'হাতে লুটে নেবে অন্যেরা কিছুই পাবে না।

এ কারণেই রসূল স. বলেছেন ঃ 'শুহ্ বা কৃপণতা থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ এটিই তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করেছে। এটিই তাদেরকে রক্তপাত ঘটাতে এবং অপরের

লেখক : প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, উত্তরা শাখা-ঢাকা।

মর্যাদাহানিকে নিজের জন্য বৈধ করতে প্ররোচিত করেছে। এটিই তাদের জুলুম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তাই তারা জুলুম করেছে। পাপের নির্দেশ দিয়েছে তাই পাপ করেছে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে বলেছে তাই তারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে। (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আহমদ) আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 'যারা শুহ্ বা মনের সংকীর্ণতা, কার্পণ্য থেকে মুক্ত থেকেছে, তারাই সফলকাম হয়েছে।' (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬)

কৃপণতার পরিধি

কৃপণতার আওতা অনেক ব্যাপক। কৃপণ ব্যক্তি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা প্রদর্শন করে এমনই সংকীর্ণতার অন্ধকার কুটিরে আবদ্ধ হয় যে তখন এর বহিপ্রকাশ তার সার্বিক চরিত্রে দৃশ্যমান হয়। তার সাথে কয়েক মিনিট কথা বললে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে লোকটি হাড়কৃপণ। শরীয়তের নির্ধারিত ব্যয় ছাড়াও নিজের ও তার পরিবারের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় ব্যয়ে যেমন সে কৃপণতা প্রদর্শন করে, তেমনি আর্থিক ব্যয়ের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রেও কৃপণতা ছড়িয়ে পড়ে। সার্বিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সহমর্মিতা চাই তা কাজে-কর্মে হোক, চাই মৌখিক, সেখানেও কৃপণ তার স্বভাবসিদ্ধ আচরণই করে থাকে। কৃপণ মুসলমান হোক বা অমুসলিম কৃপণতা তাকে এমনই অন্ধ করে তোলে যে, সে আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তিকে অস্বীকার করে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 'তুমি কি তাকে দেখেছ যে আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তিকে মিথ্যা বলছে। সে-ই তো এতিমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ করে না। তারপর সেই নামাযীদের জন্য ধ্বংস, যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফিলতি করে, যারা লোক দেখানো কাজ করে এবং মামুলী প্রয়োজনের জিনিসপাতি (প্রতিবেশীদের) দিতে বিরত থাকে। (সূরা মাউন ১-৭) এ সূরার শেষের আয়াতের ব্যাখায় বিভিন্ন হাদীস বিশারদ, রাবী ও মুফাস্সিরগণ ফরয যাকাত থেকে শুরু করে মানুষের গৃহস্থালীর কাজে লাগে এ ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন হাঁড়ি-পাতিল, বালতী, দা-কুড়াল, দাড়িপাল্লা, লবণ, পানি, আগুন, দিয়াশলাই ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। আমরা আমাদের সমাজে এ ধরনের হীন মনোবৃত্তির কিছু কিছু কৃপণ ব্যক্তিদের দেখতে পাই, যারা এ ধরনের ছোট্ট জিনিসও তার প্রতিবেশীকে ধার দিতে চায় না। মানুষ সামাজিক জীব। তাই সমাজের প্রতিটি বাসিন্দাই পরস্পর নির্ভরশীল। আর এ নির্ভরশীলতার ভিত্তি হলো সামাজিক ভ্রাতৃত্ব। এ জন্য কারো বাড়িতে মেহমান এলে প্রতিবেশীর কাছে খাটিয়া বা বিছানা-বালিশ চাইবে, প্রতিবেশীর চুলোয় একটু রান্না-বান্না করে নেবে, এক বাটি লবণ বা চিনি চাইবে এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু কৃপণেরা তাও দিতে চায় না। এরা সমাজের আলাদা এক জীব্ সামাজিক বন্ধন বা ভ্রাতৃত্ব এদের কাছে মূল্যহীন। ইসলামের শাশ্বত বিধান হচ্ছে পৃথিবীর সকল সম্পদের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ তাআলা। মানুষ এর ট্রাস্ট্রি মাত্র। কাজেই আল্লাহ তাআলার এ সম্পদ হতে মানুষ সমান ভাবে উপকৃত হবে। যেহেতু ইসলামের জন্ম পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় হয়নি, সেহেতু ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থকে এক সাথে দেখে। একদিকে ব্যক্তিকে তার সমৃদ্ধির উৎসাহ দেয়, অন্য দিকে

ব্যক্তিকে সমাজের অংশ হিসাবে সমাজের অন্যদের সুখ ও সমৃদ্ধি সাধনের দায়িত্ব অর্পণ করে। সুতরাং এ ধন-সম্পদ নিজেদের হিফাজতে থাকাকালীন সময়ে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার অধীনে তা থেকে নিজেদের কাজে ব্যয় করবে এবং অন্যদেরকেও দান করবে। আল্লাহর সীমারেখা হলো ঃ

এক. ধন-সম্পদ আহরণের জন্য সকল প্রকার অবৈধ পন্থা পরিহার করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ 'একে অপরের সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভোগ করো না। তবে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের রাজি-খুশির ভিত্তিতে ব্যবসার মাধ্যমে তা হতে পারে।' (সূরা নিসা ঃ ২৯)

দুই. বৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ অপচয় বা অবৈধ পন্থায় ব্যবহার করা যাবে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ 'সম্পদ ব্যয়ে সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ্ তাআলা অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আনয়াম ঃ ৪১) 'অপব্যয় করো না। অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই, আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ।' (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭)

তিন. বৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ শুধু নিজের আয়ত্বাধীনে সঞ্চিত বা পুঞ্জিভূত করে রাখা যাবে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ 'অধিক ধন-সম্পদ, আয়-উপার্জন ও সঞ্চয়ের চিন্তা তোমাদেরকে নিমজ্জিত করে রেখেছে। এভাবে চিন্তা করতে করতে শেষ পর্যন্ত তোমরা কবরে চলে যাবে। অতি সত্বর তোমরা এর পরিণতি জানতে পারবে।' (সূরা তাকাসুর ঃ ১-৩) আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন ঃ 'যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না তাদের কষ্টদায়ক আযাবের সংবাদ পাঠিয়ে দাও।' (সূরা তাওবা ঃ ৩৪)

এ ক্ষেত্রে ইসলাম একটি মধ্যপন্থা অবলম্বনের জন্য জোর তাগিদ প্রদান করেছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ জাতির পথ প্রদর্শক হিসাবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূল স. কে এ ধরনের নসিহতই করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ 'তোমার হাত গলার সাথে বেঁধে রেখো না, (অর্থাৎ ব্যয়ের বেলায় কৃপণ হয়ো না) আর একেবারে খোলা ছেড়েও দিও না (অর্থাৎ নিজের সব কিছু উজাড় করে দিয়ে খালি হাতে বসে থেকো না) অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত হবে ও অক্ষম হয়ে যাবে।' (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯) এর অর্থ হলো লোকদের মধ্যে এতটুকু ভারসাম্য থাকতে হবে যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের আবর্তন রুখে না দেয় এবং অপব্যয়ী হয়ে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস না করে ফেলে। এ দু'টির মাঝামাঝি তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন সঠিক অনুভূতি থাকতে হবে যার ফলে তারা যথার্থ ব্যয় থেকে বিরত হবে না। আবার অযথা ব্যয়জনিত ক্ষতিরও শিকার হবে না।

কৃপণতা একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করে। একটি সুস্থ সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট হলো ভ্রাতৃত্ববোধ। এটি ছাড়া কখনো একটি সুস্থ-সুশীল সমাজ গঠিত হতে পারে না। আর ইসলামই একমাত্র এ ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষে যথোপযুক্ত কর্মসূচি দিয়েছে। মুসলমানদের আল্লাহর পথে দান করার সাধারণ নির্দেশ দিয়ে তাদের অর্থসম্পদে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকার কায়েম করেছে। এর অর্থ হচ্ছে মুসলমানকে দানশীল, উদার,

সহানুভূতিশীল ও মানব-দরদী হতে হবে। স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা পরিহার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিটি সৎকাজে এবং ইসলাম ও সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ব্যয় করতে হবে। ইসলাম শিক্ষা ও অনুশীলন এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সামষ্টিক পরিবেশ কায়েমের মাধ্যমে প্রতিটি মুসলমানের মধ্যে এ নৈতিক বল সৃষ্টি করতে চায়। এ ভাবে কোন প্রকার বল প্রয়োগ ছাড়াই হৃদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় মানুষ সমাজের কল্যাণে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে। ইসলামী সমাজে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পরস্পরকে আর্থিক সাহায্য তথা ঋণ দেয়া অপরিহার্য কর্তব্যরূপে চিহ্নিত হবে। এ ধরনের কর্তব্যবোধ একটি সমাজের সুস্থতার পরিচায়ক। যদি কোন সমাজে এর অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় তবে বুঝতে হবে সেখানকার পরিবেশ দূষিত হয়ে গেছে এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলোর মধ্যে শিথিলতা দেখা দিয়েছে। মুসলমানকে দানশীল, উদার হৃদয়, সহানুভূতিশীল , মানব-দরদী ও পারস্পরিক কল্যাণকামী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য নামাযসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলো সামষ্টিক ভাবে কাজ করে থাকে। সুতরাং এগুলো পালন করার পরও যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে কৃপণতার স্বভাব বিদ্যমান থাকে, তবে বুঝতে হবে তার বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলোতে গলদ আছে।

কৃপণতা একটি জঘন্য অভ্যাস্। আল-কুরআনের একাধিক আয়াতে এটিকে অকল্যাণকর বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং কুরআনে কৃপণ ব্যক্তিকে কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 'যারা আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদের বেলায় কৃপণতা প্রদর্শন করেছে সে সম্পদ কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি হবে।' (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮০) 'যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।' (সূরা তওবা ঃ ৩৪) এ দুটি আয়াতে এটি একটি অকল্যাণকর ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রসূল স. বলেছেন ঃ কৃপণ ব্যক্তি জান্নাত হতে দূরে, আল্লাহ হতে দূরে, কিন্তু জাহান্নামের নিকটবর্তী।' (তিরমিযী)

যারা অর্থগৃধ্নু ও অর্থলোলুপ মূলত তারাই হাড়কৃপণ হয়। সম্পদের পূজা করতে করতে এক পর্যায়ে তার মধ্যে মানবিক প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতি কোন কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। এমনকি তার নিজের লোককেও চরম বিপদের সময়ে দান করতে সে কুণ্ঠাবোধ করে। অথচ একটি সুস্থ সমাজের জন্য এর অধিবসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও কল্যাণকামী মানসিকতা অপরিহার্য। এ গুণ সম্পন্ন সমাজ পারস্পরিক ত্যাগ স্বীকার করে। কৃপণ ব্যক্তিদের অন্তর কখনো পরস্পর মিলেমিশে থাকতে পারে না। ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজে ভ্রাতৃত্বের প্রবল টানে সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদ বন্টন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ সমাজের অধিবাসীরা হবে একাধারে নৈতিক, কল্যাণকামী এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন পরস্পরের বন্ধু। যেমন ঃ আল কুরআনের ঘোষণা, 'ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে পরস্পর পরস্পরের দায়িত্বশীল বা সাহায্যকারী বন্ধু। এদের পরিচয় এবং বৈশিষ্ট এই যে, এরা নেক কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত

আদায় করে, আল্লাহ ও রসূলের বিধান মেনে চলে। প্রকৃতপক্ষে এদের প্রতিই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন।' (সূরা-তাওবা ৭)
সমাজে যারা কৃপণ তারই সাধারণত কায়েমী স্বার্থবাদী হয়ে থাকে। সমাজের মানুষকে শোষণ করতে করতে এরা সম্পদের পাহাড় জমা করে। একদিকে শোষণের ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং অন্যদিকে সম্পদের পাহাড়কে ধরে রাখার জন্য এরা কায়েমী স্বার্থবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সম্পদের লোভে এতটাই অন্ধ হয়, যে কোন পরিবর্তনের এরা বিরোধিতা করে থাকে। এ জন্য যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনকে যে সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাদের অন্যতম হলো কায়েমী স্বার্থবাদী। তারা কখনোই ইসলামী আন্দোলনকে সহ্য করতে পারেনি। কৃপণতা এমন ধরনের কায়েমী স্বার্থবাদী সৃষ্টি করে থাকে যে এরা অবশেষে ইসলামের দুষমণে পরিণত হয়।
ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদের সুষম বন্টন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। যাকাত হবে এ সমাজে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়াও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে শরীয়ত সম্মত আরো কয়েকটি Tools যেমন ঃ সাদাকা, মীরাস, ওশর, খারাজ ও জিযিয়া ইত্যাদি। কৃপণেরা এর একটিকেও স্বীকার করে না। কৃপণ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত সমাজ ব্যবস্থায় যাকাত নামক মৌলিক ইবাদতের কোন মূল্য থাকে না। ফলে সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদের সুষম বন্টন ব্যাহত হয় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য হুমকির সম্মুখীন হয়। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমাজে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের জন্যই যাকাত ফরয করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ 'তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।' (সূরা আল জারিয়াহ-১৯) কিন্তু কৃপণ ব্যক্তিদের কাছে এর কোনটিরই মূল্য নেই। ফলে সমাজ ব্যবস্থায় ধনী ও গরীবের মধ্যে পাহাড় সম বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এবং সম্পদ গুটিকয়েক কৃপণ ব্যক্তি বা পরিবারের হাতে কুক্ষিগত হয়। জাতীয় উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়ে।
সুদ কৃপণ শ্রেণী গোষ্ঠীদের শোষণের প্রধান হাতিয়ার। যারা সুদখোর তারাই কৃপণ আবার যারা কৃপণ তারাই সুদখোর। কৃপণ ও সুদখোর পরস্পরের পরিপূরক। কৃপণেরা যেমন টাকা আর সম্পদের লোভে মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়, অনুরূপভাবে সুদখোরও টাকার পিছনে পাগলের মতো ছুটে ভারসাম্যহীন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এদের স্বার্থপরতার মাত্রা এতটুকু বৃদ্ধি পায় যে, তারা তখন পৃথিবীর কোন কিছুর পরোয়া করে না। তাদের সুদখোরীর কারণে এক পার্যায়ে মানবিক প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির মাত্রা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। এমনকি তার নিজের লোককেও চরম বিপদের সময়ে বিনা সুদে ধার দিতে কুণ্ঠাবোধ করে। সুদ তাকে এতটুকু অন্ধ করে তোলে যে, জাতীয় সামষ্টিক কল্যাণের ওপর কোন ধ্বংসকর প্রভাব পড়লো এবং কতলোক দুরবস্থার শিকার হলো এসব বিষয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথাই থাকে না। বিত্তবৈভব

জমানোর নেশায় এরা অহর্নিশ ব্যস্ত থাকে। আর যেহেতু মানুষকে আখেরাতে সেই অবস্থায় ওঠানো হবে যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে তাই কিয়ামতের দিন সুদখোর ব্যক্তি একজন পাগল ও বুদ্ধিভ্রষ্ট লোকের চেহারায় আত্মপ্রকাশ করবে। সুদের মাধ্যমে সমাজের নিম্ন আয়ের লোকদের অবশিষ্ট সামান্য সম্পদটুকুও জোঁকের ন্যায় শুষে নেয়। ফলে ধনী ও গরীবের মধ্যে পাহাড় সম বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

সমাজে এমন কিছু মূল্যবোধ বিবর্জিত লোকও দেখা যায়, যারা কৃপণ এবং দানশীল কোনটিই নয়। তবে বেহুদা কাজে টাকা পয়সা ঠিকই খরচ করে থাকে। যাকাত ও ইসলামের অন্যান্য আবশ্যিক ব্যয়ের প্রতি তারা ভ্রুক্ষেপই করে না। বিভিন্ন পার্টি ও অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। খ্যাতি, সুনাম অথবা আবেগের বশবর্তী হয়ে ক্লাব, নাটক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা ডোনেশন প্রদান করে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে নিজের মিল-ইন্ডাস্ট্রির স্বল্পভেতন ভোগী সাধারণ শ্রমিকটির বেতন মাসের পর মাস বাকি পড়ে আছে। তার বিবেকের কঠিন দরজায় শ্রমিকের কষ্ট ও করুণ কান্নাও বিবেকের কড়া নাড়াতে প্যারে না। এটি কৃপণতাজনিত একটি বদ অভ্যাস। এ ধরনের আচরণ ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শ্রমিকের গা-এর ঘাম শুকানোর আগেই মজুরী পরিশোধের তাগিদ দিয়েছেন মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদুর রসূল স.। তাছাড়া এদের কঠিন হৃদয়ের কাছে রসূলের স. এর আরেকটি বাণী উপস্থাপন করতে চাই। রসূল স. বলেছেন ঃ 'তোমাদের চাকর-চাকরানী ও দাস-দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেনো তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ যেনো তার ওপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপানো হয়, তবে তা সম্পাদনের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা উচিত।' (বুখারী-মুসলিম)

মুমিন কৃপণ

মুমিন কখনো কৃপণ হতে পারে না। মুমিন অবশ্যই উদার মনের অধিকারী হবে। কারণ সংকীর্ণতা বা কৃপণতা হলো ইহুদীদের ও মুশরিকদের বৈশিষ্ট। হযরত আবু সাইদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, নবী স. বলেছেনঃ 'দুটি স্বভাব এমন যা কোন মুসলমানের মধ্যে থাকতে পারে না। অর্থাৎ কৃপণতা ও দুশ্চরিত্রতা। (তিরমিযি, আবু দাউদ) আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেনঃ 'কৃপণতা এবং ঈমান কোন মুসলমানের অন্তরে একত্রে অবস্থান করতে পারে না।' (নাসায়ী) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 'তোমরা কিছুতেই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতোক্ষণ না নিজেদের প্রিয় বস্তু দান করবে।' (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২) আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ 'দান করো। এতে তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণ রয়েছে। যারা মনের সংকীর্ণতা বা কার্পণ্য থেকে মুক্ত থেকেছে, তারাই সফলকাম হয়েছে।' (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬) এ ছাড়াও আরো অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে দানের নির্দেশনা রয়েছে এবং কৃপণতার কঠিন শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে।

আইনগত দিক

এতকিছুর পরও যদি কোন মুমিন ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে এ ধরনের কার্পণ্য নামক বদ অভ্যাস থাকে, তবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তিনি কবিরা গুনাহ করছেন এবং ইচ্ছাকৃত এ গুনাহের দরুন তিনি ফিসকে লিপ্ত রয়েছেন। খলিফাতুর রসূল স. আমিরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এ ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। যদিও তারা ঈমান পোষণ করত এবং সালাত-সওম পালন করত।

পৃথিবীর ইতিহাসে নিকৃষ্ট ব্যক্তিরাই কৃপণ ছিল। তাই কোন মুসলমানের এ ধরনের নিকৃষ্ট গুণের অধিকারী হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তাআলা এ ধরনের নিকৃষ্ট গুণের অধিকারীকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। কারুন ও আবু লাহাব ছিল এদের অন্যতম। কৃপণ ব্যক্তিদের ধ্বংসের করুণ ইতিহাস আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা এ ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, 'আমি সেই ধরনের কত গ্রাম-গঞ্জ ও বস্তিই না ধ্বংস করে দিয়েছি যারা স্বীয় জীবিকা ও সহায়-সম্পদ নিয়ে গর্ব-অহংকার করতো। এখন তাদের ঘর-বাড়ীর পানে তাকাও এর পর কম সংখ্যক লোক এ ঘর বাড়িতে বসবাস করেছে। এখন আমিই তার উত্তরাধিকারী হয়ে বসেছি।' (সূরা কাসাস ঃ ৫৮) 'আমি যে সব জনপদে (ধ্বংসপ্রাপ্ত) কোন একজনকে সতর্ককারী মনোনয়ন দিয়ে প্রেরণ করেছি, সেখানে ধনাঢ্য লোকেরা তাকে বলতো-তুমি যে নবুয়তের পয়গাম নিয়ে এসেছ, আমরা তা অস্বীকার করি। তারা এও বলতো, আমরা তোমার তুলনায় অধিক সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মালিক। সুতরাং আমাদেরকে শাস্তিভোগ করতে হবে না।'

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি আমাদেরকে কৃপণতা নামক আত্মিক ও সামাজিক অপরাধ থেকে মুক্ত হতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের তাওফীক দিন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনের অর্থনীতি ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.।
২. ইসলামী অর্থনীতি ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.।
৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.।
৪. ইসলামী অর্থনীতি ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.।
৫. ইসলামী অর্থনীতি ঃ মাওঃ আবদুর রহিম র.।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, পৃষ্ঠা : ৩০-৪৭

রসূল স. নিযুক্ত বিচারকমণ্ডলী ও রসূল স. নির্দেশিত বিচারকের শিষ্টাচার

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ আল আন্দালুসী

দুই

হাদীসের আলোকে বিচারকের শিষ্টাচার

হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে বিচারকের জন্যে এমন কিছু আদব বা কার্যপ্রণালীর কথা বলা হয়েছে যেগুলো বিচারকার্য সম্পাদনের সময় অনুসরণ করা প্রত্যেক বিচারকের জন্য জরুরী। হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে আমরা এখানে কয়েকটির আলোচনা করবো।

১. ক্ষুব্ধ অবস্থায় বিচার না করা : ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাই র. হযরত আবু বকর রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করীম স. বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন ক্ষুব্ধ অবস্থায় বিবদমান দু'জনের মধ্যে ফয়সালা না করে।'

ইমাম বুখারীর র. একটি রেওয়ায়েতে 'ক্ষুব্ধ অবস্থায় বিচারক যেন বিবদমান দু'পক্ষের মধ্যে ফয়সালা না করে' বর্ণিত হয়েছে। মনোবিজ্ঞানীগণ এর কারণ সম্পর্কে বলেন, ক্ষুব্ধ অবস্থায় মানুষের রক্তপ্রবাহের গতি বেড়ে যায়, ফলে ক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে ঠিক বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহর শরীয়ত তো সঠিক সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে। এজন্যই রসূল স. বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বিচারক নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ না করতে পারে ততোক্ষণ পর্যন্ত যেন সে কোন বিচারের ফয়সালা না করে। কারণ তাতে ভুল বা অসত্যের পক্ষে ফয়সালা দেয়ার আশংকা থাকে।

২. উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করা ঃ ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম তিরমিযী তাঁদের সংকলিত সুনানে এবং ইমাম হাকেম তাঁর সংকলিত মুসতাদরাকে হযরত আলী রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূল স. বলেছেন, যদি দু'জন লোক তোমাদের কারো কাছে তাদের মোকদ্দমা নিয়ে আসে, তাহলে পরবর্তী ব্যক্তির বক্তব্য না শুনে প্রথমে বক্তব্য পেশকারী ব্যক্তির পক্ষে ফয়সালা দিয়ো না। কেননা পরবর্তী ব্যক্তির বক্তব্য শোনার পরই কেবল তুমি বুঝতে পারবে, তোমাকে কি ফয়সালা দিতে হবে।

লেখক, মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ ইবনে তুল্লা আল-আন্দালুসী ৪০৪ হিজরী সনে স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সমকালীনদের মধ্যে তিনি ছিলেন বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস। 'আকযিয়াতুর রসূল' স. তাঁর অমর সংকলন, যা আজো সারা বিশ্বে মুসলমান গবেষক ও পাঠকদের কাছে অদ্বিতীয় সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে আদৃত।

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে সূত্র বিবেচনায় হাসান বলেছেন। ইমাম হাকেম বলেছেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ্। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফে উভয় ইমাম এই হাদীসটি সংকলন করেছেন।

৩. বিচারকের মুখোমুখি বাদী বিবাদী উভয়ের বসার ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা ঃ মুহাম্মদ ইবনে নাঈম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নাঈমের পিতা হযরত আবু হুরায়রা রা. কে ফয়সালা করতে দেখেছেন। তিনি বলেন, একবার হারেস ইবনে হাকেম এসে হযরত আবু হুরায়রার সাথে একই আসনে বসে গেল। আবু হুরায়রা মনে করলেন, কোন মোকদ্দমা ছাড়া সে হয়ত অন্য কোন কারণে এসেছে। ঠিক সেই সময় অপর এক ব্যক্তি এসে হযরত আবু হুরায়রার সামনে বসে গেল। আবু হুরায়রা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি উদ্দেশ্যে এসেছো? লোকটি বলল, হারেস আমার উপর অত্যাচার করেছে। তখন আবু হুরায়রা হারেসকে নির্দেশ দিলেন, উঠো, তোমার প্রতিপক্ষের সাথে গিয়ে বস। কেননা, এটা আবুল কাসেম (রসূল) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। আল্লামা ওয়াকী র. এই বর্ণনাটি 'আখবারুল কাযা' গ্রন্থে এবং হারেস ইবনে আবু উসামা তাঁর সংকলিত মুসনাদে সংকলন করেছেন।

মোকদ্দমায় উভয় পক্ষকে একই মানের আসনে বসানো জরুরী। কেননা, বিচারের বেলায় যদি কারো প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির অন্যের উপর অত্যাচারের দুঃসাহস বেড়ে যেতে পারে।

৪. বিচারের বেলায় সম্বোধন ও দৃষ্টির ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করা ঃ ইমাম বায়হাকী ও দারা কুতনী তাঁদের সংকলিত সুনানে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা রা. সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন। রসূল স. বলেছেন, মুসলমানদের বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরীক্ষায় যাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তার উচিত হবে উভয় পক্ষের মধ্যে দৃষ্টি ও বসার মধ্যে সমতা বজায় রাখা। কারণ, বিচারপ্রার্থী উভয় পক্ষের কারো মধ্যে এমন কোন সংশয় সন্দেহের জন্ম দেয়া উচিত নয়, যাতে তাদের কেউ মনে করতে পারে বিচারক প্রতিপক্ষের প্রতি ঝুঁকে রয়েছে। এর ফলে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তার মধ্যে সংশয় দেখা দিতে পারে।

৫. দু'পক্ষের কাউকে উচ্চ আওয়াজে বিচারকের না ডাকা বা ধমকের স্বরে কথা না বলা ঃ ইমাম বায়হাকী ও দারা কুতনী তাঁদের সংকলিত সুনানে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামার রেওয়ায়েত নকল করেছেন। রসূল স. বলেছেন, যাকে মুসলমানদের কাযী হওয়ার পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছে, সে যেন দু'পক্ষের মধ্যে কোন এক পক্ষের ক্ষেত্রে কথা বলার সময় আওয়াজ বেশি উচ্চ না করে বা ধমকের স্বরে কথা না বলে।

৬. কোন এক পক্ষকে বিচারকের মেহমান হিসেবে বরণ করার নিষেধাজ্ঞা ঃ হযরত ইসমাঈল ইবনে মুসলিম হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী রা. যখন কুফায় অবস্থান করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে মেহমান হিসেবে আসলো। অতঃপর সে হযরত আলীর কাছে একটি মোকদ্দমা দায়ের করল। তখন আলী রা. তাকে বললেন, 'এখন তুমি মোকদ্দমার একপক্ষ, তাই

অন্য কারো বাড়িতে গিয়ে অবস্থান কর। কারণ রসূল স. বিবদমান দু'পক্ষের কোন একজনকে মেহমান হিসেবে বরণ করতে নিষেধ করেছেন, যতোক্ষণ আমরা অপর পক্ষকেও মেহমান হিসেবে বরণ না করি। বিবদমান দু'পক্ষের মধ্যে সমতা রক্ষার জন্যে এটি একটি কার্যকর বিধান।

৭. উভয় পক্ষ স্থির হয়ে বসার আগে মামলার শুনানী শুরু না করা ঃ ইমাম আবু দাউদ ও বায়হাকী তাঁদের সুনানে এবং ইমাম হাকেম তাঁর সংকলিত গ্রন্থ মুসতাদরাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের সূত্রে রেওয়ায়েত করেন, রসূল স. ফয়সালা দিয়েছেন, (শুনানী শুরুর আগে) উভয় পক্ষ বিচারকের সামনে সমমানের আসনে বসবে।

হাকেম বলেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের সংকলিত সহীহতে এ হাদীস নকল করেননি। হাফেজ যাহবী ইমাম হাকেমের এ মতকে সমর্থন করেছেন।

৮. বিচারের ক্ষেত্রে অভিজাত ও অনভিজাত, গোলাম ও আযাদ উভয়ের মধ্যে সমতা বজায় রাখা ঃ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের সংকলিত সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূল স. বলেছেন, সাধারণ মানুষ পালের শত উটের মতো, যেখানে তুমি খোঁজ করলে সওয়ারী করার মতো একটিকেও পাবে না।

এই হাদীসের মর্মকথা হলো, ইসলামের দৃষ্টিতে বিচারের ক্ষেত্রে সব মানুষ সমান। ইসলামে বংশ মর্যাদা আশরাফ আতরাফ ধনী দরিদ্রের কোন ভেদাভেদ নেই। পালের শত উটের মধ্যে যেমন একটিও সওয়ার উপযোগী নয় তদ্রূপ সাধারণ মানুষ।

বিচারের ক্ষেত্রে বিচারককে এজন্যে আশরাফ আতরাফ আযাদ গোলাম ধনী-গরীব, উঁচু-নীচের পার্থক্য করার অবকাশ নেই। এর দ্বারা সমাজের সকল মানুষের মধ্যে সমতা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

৯. অত্যধিক ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় বিচার না করা ঃ ইমাম বায়হাকী ও তাবরানী হযরত আবু সাঈদ সূত্রে বর্ণনা করেন। রসূল স. বলেছেন, বিচারক পরিপূর্ণ তৃপ্ত অবস্থায় বিচার করবে। অর্থাৎ ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় বিচারকার্য পরিচালনা করবে না।

ইতিহাসখ্যাত বিচারক কাযী শুরাইহি এর যদি ক্ষুধা পেত, কিংবা তিনি ক্ষুব্ধ বা তৃষ্ণার্ত থাকতেন তাহলে বিচারকের আসন ত্যাগ করে উঠে যেতেন। এর কারণ হলো, অত্যধিক ক্ষুধা ও ক্ষোভ মানুষের চিন্তাশক্তিকে প্রভাবিত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমতাবস্থায় বিচারকের পক্ষে সঠিক বিষয়টি নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

রসূল স. এর নিযুক্ত বিচারকমণ্ডলী

আগের আলোচনায় আমরা এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছি যে, রসূল স. ছিলেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বিচারক এবং এ পদে রসূল আল্লাহ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের রব-এর কসম! তারা ততোক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচারের ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা সংকোচ না থাকে, এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।[১]

মুসলিম সালতানাতের পরিধি যখন বিস্তৃত হল এবং মানুষকে সংশোধন প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন বিদেশী প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা, যাকাত আদায় ও বিতরণ, গনীমতের সম্পদ আহরণ, হিসাব ও বিতরণ তথা রাষ্ট্রীয় বহুবিধ কাজ কর্মে রসূল স. এর ব্যস্ততা যখন বেড়ে গেল তখন রসূল স. বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসক, বিচারক ও আহ্বায়ক নিয়োগ করেন। তারা রসূল স. এর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। রসূল স. আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায় বিচারের যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, সেই আলোকেই এই প্রতিনিধিবৃন্দ বিচার ফয়সালা করতেন, যাতে ইসলামী শরীয়তের আলোকে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থায় কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি কোন দুর্বল ব্যক্তির উপর অত্যাচার কিংবা অসহায় মানুষের সহায় সম্পদ শক্তির জোরে গ্রাস করার সাহস না পায়।

রসূল স. তাঁর শাসনামলে যেসব সাহাবীকে শরীয়তের বিধান মতো বিচার ফয়সালা করার জন্যে বিচারক নিয়োগ করেছিলেন, তাদের কয়েক জনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আমরা এখানে তুলে ধরব। রসূল স. কর্তৃক নিযুক্ত বিচারকদের কয়েকজন এমন ছিলেন, যারা রসূল স. এর উপস্থিতিতেই বিচার করতেন, যাতে রসূল স. প্রত্যক্ষভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, আবার কয়েকজন নিযুক্ত হয়েছিলেন মদীনা থেকে অনেক দূরে বিভিন্ন দূরবর্তী শহরে। কিন্তু তাদের প্রতিটি ফয়সালাই রসূল স. এর কাছে রিপোর্ট করা হতো। রসূল স. সেগুলোর খবর শুনে হয় সঠিক বলে মতামত দিতেন নয় তো কোন ভুল ত্রুটি থাকলে তা সংশোধনের নির্দেশ দিতেন। রসূল স. এর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থায় এই রীতি চালু ছিল এবং এমন অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন যে, তাঁর নিযুক্ত বিচারকগণ তাঁর অসন্তুষ্ট হওয়ার মতো কোন ফয়সালা করেননি।

১. হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা.

নামঃ আলী ইবনে আবু তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ কুরায়শী হাশেমী। উপনাম আবু হাসান। ছোটদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। রসূল স. এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত পালিত হন হযরত আলী রা.। বয়সন্ধিকালে রসূল তনয়া হযরত ফাতেমা রা. কে বিয়ে করেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রা. এর শাহাদতের পরে চতুর্থ খলীফা হিসেবে তিনি খিলাফতে অভিষিক্ত হন। চার বছর সাড়ে আটমাস তিনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৪০ হিজরী সনের ১৭ই রমযান রাতের বেলায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। তাঁর মর্যাদা সম্মান মানাকিবের আলোচনা ব্যাপক পরিসরের দাবী রাখে।

আল্লামা ওয়াকী 'আখবারুল কাযা' গ্রন্থে রসূল স. এর এই বাণী উদ্ধৃত করেছেন, 'ইন্না আলীয়্যান আক্‌যা উম্মাতী' 'আমার উম্মতের মধ্যে আলী সর্বোত্তম বিবাদ মীমাংসাকারী'। এখন শুনুন বিচারক পদে তাঁর অধিষ্ঠিত হওয়ার কাহিনী।

ইমাম আবু দাউদ র. সুনান আবুদাউদ এ কিতাবুল কাযা বাবু কাইফাল কাযা (কাযা অধ্যায়ে, 'বিচার কিভাবে হবে' পরিচ্ছেদে) এবং ইমাম তিরমিযী কিতাবুল আহকাম বাবু মা জাআ ফিল কাযী--সুনানে তিরমিযীর আহকাম অধ্যায়ের 'কাযী উভয়ের বক্তব্য শোনার আগে বিচারের

ফয়সালা দেবে না' পরিচ্ছেদে হযরত আলী রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, আমাকে রসূল স. ইয়েমেনে কাযী নিয়োগ করেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে বিচারক নিয়োগ করছেন আমার তো বয়স কম, তাছাড়া আমার তো এ ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতাও নেই। রসূল স. বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার অন্তরকে পথনির্দেশনা দেবেন এবং তোমার মুখ থেকে সঠিক ফয়সালাই প্রকাশ করবেন। অতপর তিনি নির্দেশনা দিলেন, বিচার প্রার্থীরা যখন তোমার সামনে বসবে তখন একজনের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত দেবে না, বরং অপর জনের বক্তব্যও প্রথমজনের বক্তব্যের মতো শুনে নেবে। তাতে তোমার পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানো সহজ হবে। হযরত আলী রা. বলেন, এরপরে আমি দীর্ঘ দিন কাযী পদে বহাল ছিলাম কিন্তু কোন বিচারের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে কখনো সংশয়ে পতিত হতে হয়নি।

হযরত আলী রা. এর এই বর্ণনার ব্যাপারে মু'তাযিলা ও জাহমিয়্যার মতো গোমরাহ দলগুলোর কতিপয় অদূরদর্শী লোক আপত্তি উত্থাপন করেছে। তাদের রীতি হলো তারা শরীয়তের যেকোন বিধানকে তাদের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে, তাদের চিন্তা ও ভাবনার অনুকূল হলে তা গ্রহণ করে নয়তো করে প্রত্যাখ্যান। শরীয়তের বিধান মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে তারা মোটেও ভাবতে চায় না, শরীয়তের কোন কোন বিধান যুক্তির বিচারে মানুষের বোধগম্য হলেও অনেক এমন বিধান রয়েছে যেগুলোর কারণ মানুষের সীমিত জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা অনুধাবন করা অসম্ভব। এই সহজ ব্যাপারটি বুঝতে না পারার কারণে মুতাযিলা ও জাহমিয়্যার মতো ইসলামের দাবীদার দলগুলো নিজেরাও গোমরাহ হয়েছে এবং অন্য অনেককেও গোমরাহ করেছে।

এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে মুতাযিলাদের উত্থাপিত আপত্তি

'আলী রা. এর মুখ দিয়ে সব সময় সঠিক ফয়সালা বের হবে' রসূল স. এর এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে মু'তাযিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত কয়েকটি দল বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করেছে। তারা হযরত আলী রা. এর কথা 'এর পর আমাকে আর কোন দিন কোন মামলা মোকদ্দমার ফয়সালা দেয়ার ক্ষেত্রে সংশয় ও দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়নি' এ ব্যাপারেও ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করেছে। এরা বলেছে, আলীর এই দাবী বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা উভয় ক্ষেত্রে অবাস্তব সাব্যস্ত হয়েছে।

যৌক্তিকতার দৃষ্টিতে তাদের আপত্তি হলো, রসূল স. আলীর ব্যাপারে এমন দু'আ কিভাবে করতে পারেন (যে, 'হে আল্লাহ! তুমি আলীর মুখ থেকে সব সময় সঠিক ফয়সালা বের করো এবং কোন ফয়সালার ক্ষেত্রে তার কোন ভুলত্রুটি হবে না) অথচ ভুলত্রুটিতো মানুষের স্বভাবজাত ব্যাপার। বাস্তবতা ও দালিলিক প্রমাণস্বরূপ তারা বলে, 'রসূল স. এর ইন্তিকালের পর আলী এমন কয়েকটি ফয়সালা করেছেন যেগুলোতে বহু সাহাবী একমত হতে পারেননি এবং তিনি নিজের ফয়সালা প্রত্যাহারও করেছেন। আর প্রত্যাহারকৃত কিংবা পুনর্বিবেচিত সেইসব ফয়সালা এমন ছিল যে, সাহাবা কেন, অনেক তাবেঈ ফকীহও সেগুলো গ্রহণ করেননি। উদাহরণস্বরূপ তারা বলে–

১. উম্মে ওয়ালাদ (অর্থাৎ মালিকের ঔরসজাত সন্তান জন্মদানকারিনী দাসী) -এর ব্যাপারে আলী একাধিক ফয়সালা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রথম এক ধরনের ফয়সালা দিয়ে পরে আবার তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।
২. হুদুদের ব্যাপারে তিনি পরস্পর বিরোধী ফয়সালা করেছেন।
৩. মুরতাদদের পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ফয়সালা দেয়ার পর হযরত ইবনে আব্বাসের ফাতওয়া সম্পর্কে যখন তিনি অবহিত হলেন তখন খুবই লজ্জিত হয়েছিলেন।
৪. হাতিবের মুক্তি দেয়া দাসীকে রজম করার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন হযরত আলী কিন্তু হযরত উসমানের কথা 'রজম তো তার বেলায় কার্যকরী হবে যে এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে' শুনে উসমানের কথাই কার্যকর করেছিলেন। কারণ সেই দাসী আরব ছিলো না। আরবী ভাষা না জানার কারণে সে ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে অনবহিত ছিল।
৫. একজন পঞ্চাশ বছর বয়স্ক ব্যক্তিকে তিনি ৮০ কোড়া মারার শাস্তি দিয়েছিলেন ফলে লোকটি মারা যায়। এর পরে তিনি লোকটির রক্তপণ (দিয়্যত) আদায় করে বলেন, লোকটির মৃত্যুর কারণে আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করে দিয়্যত দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তাছাড়া তার দেয়া নিম্নলিখিত ফয়সালাগুলো তাকে প্রত্যাহার করতে হয়েছিল।
ক. পানাহারযোগ্য জিনিসের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত জিনিস মাত্র তিনটি।
খ. চোরের হাত আঙুলের গোড়া পর্যন্তই কাটা উচিত।
গ. অপ্রাপ্ত বয়স্ক চোরদের হাতের আঙুল পিষে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া উচিত।
ঘ. শিশুদের কৃত অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে শিশুদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত।

উত্থাপিত আপত্তির জবাব

হযরত আলীর বিভিন্ন ফয়সালা সম্পর্কে মু'তাযিলা ও অন্যান্য গোমরা দলগুলোর উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবা রা. (মৃত্যু ২৭৬ হি:) তাঁর রচিত 'তা'বীলু মুখতালফালি হাদীস' গ্রন্থে। এর ১৫৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, হযরত আলীর কথা ও অন্তর সত্য ও সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়ার উপর অবিচল থাকার দু'আ করার মধ্যে রসূল স.-এর এমন উদ্দেশ্য ছিল না যে, জীবনে তার আর কোন ভুল ত্রুটি হবে না। কারণ এমনটি না হওয়া তো আল্লাহর বৈশিষ্ট যা কোন মাখলুকের থাকতে পারে না। রসূল স. এর দু'আ করার উদ্দেশ্য ছিল, তার অধিকাংশ ফয়সালা হবে সঠিক এবং তার কথার মধ্যে বিশুদ্ধতার পরিমাণ বেশি থাকবে। রসূল স. এর এই দু'আ ছিল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের জন্যে কৃত দু'আর মতো। ইবনে আব্বাসের জন্যে রসূল স. দু'আ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তাকে দীনের পরিপূর্ণ বুঝ এবং কুরআনের জ্ঞান দান করো।' রসূল স. এর এই দু'আ করার পরও কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস পূর্ণ কুরআন শরীফের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। তিনি নিজেই বলতেন, 'হান্নান' 'আওয়াহ' 'গিসলীন' ও 'রাকীম' শব্দের অর্থ আমি জানি না। উপরের বিষয়গুলো অনুধাবন করার পাশাপাশি একথা মনে রাখতে হবে, হযরত আলী এমন কিছু জটিল বিষয়ের সঠিক ফয়সালা দিয়েছেন, হযরত

উমর ও অন্যান্য বড়বড় অভিজ্ঞ সাহাবীরাও তা বুঝতে পারছিলেন না। হযরত উমর আলী সম্পর্কে বলেন, 'আলী না থাকলে উমর ধ্বংস হয়ে যেতো।' উমর আরো বলেন, 'আমি এমন সবধরনের সমস্যা ও সংকট থেকে আল্লাহর কাছে নিষ্কৃতি চাই যে সমস্যা বা সংকট নিরসনে আবুল হাসান না থাকবে।' বিভিন্ন সাহাবী যেমন হযরত আলী, হযরত উমর,আবু হুরায়রা, হাসসান ইবনে সাবিত, আমীর মুআবিয়া প্রমুখ সম্পর্কে রসূল স. যে সব দু'আ করেছেন এসব দু'আর উদ্দেশ্য ও অর্থ সব সময়ের জন্যে নয় বিশেষ অবস্থায় ও সময়ের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য।

২. হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা.

নাম : মুআয ইবনে জাবাল ইবনে আমর ইবনে আওস্ আবু আবদুর রহমান আনসারী আলখাযরাজী। হালাল ও হারাম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ছিল। এ বিষয়টি তাকে সমকালীনদের মধ্যে শীর্ষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল। আবু ইদরিস্ খাওলানী বলেন, তার গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল, চেহারা দীপ্তিময়, দাঁত ঝকমকে এবং চোখ ছিল মায়াবী। কাব বিন মালিক বলেন, মুআয ইবনে জাবাল ছিলেন সুন্দর, আকর্ষণীয় অবয়ব ও উদার চিত্তের অধিকারী তার গোত্রের যুবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আল্লামা ওয়াকেদী বলেন, তিনি সব গায্ওয়ায় (যে সব যুদ্ধে রসূল অংশগ্রহণ করেছেন) অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রসূল স. থেকে এবং তার কাছ থেকে ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, ইবনে আদী, ইবনে আবী আওফা আশআরী, আবদুর রহমন ইবনে সামুরা, জাবের ইবনে আনাস ছাড়াও বড় বড় তাবেঈগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। খলীফা হযবত উমর রা. তাঁকে খুবই সম্মান করতেন এবং বলতেন, 'আমাদের মহিলারা মু'আযের মতো কৃতী সন্তান জন্ম দানে অক্ষম, যদি মুআয না থাকতো তাহলে উমর ধ্বংস হয়ে যেতো।' কাব ইবনে মালিক রা. বলেন, মুআয ইবনে জাবাল রসূল স. ও আবু বকর রা. এর জীবদ্দশায় মদীনায় ফাতওয়া দিতেন। ইবনে সাদ তাঁর রচিত তাবকাতে এসব বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

আল্লামা সাইফ তাঁর রচিত আলফাতাহ গ্রন্থে উবায়েদ ইবনে সাকান থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূল স. যখন হযরত মু'আযকে ইয়েমেন পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি বলেন, 'দীনের ব্যাপারে তোমার সমস্যার কথা আমি জানি, আমি এও জানি ঋণের চাপে রয়েছো তুমি। এজন্য উপঢৌকনকে আমি তোমার জন্যে হালাল ও উৎকৃষ্ট করে দিচ্ছি। তোমাকে যদি কোন ব্যক্তি উপঢৌকন দেয় তাহলে তুমি তা কবুল করে নিও।'

একই সনদে সাইফ বর্ণনা করেন, মুআয ইবনে জাবালকে আলবিদা বলে রসূল স. তার জন্যে এমর্মে দু'আ করেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাকে সামনে পিছনে ডানে বামে উপরে নীচে সর্ব দিকে তাঁর হেফাযতে রাখুন এবং মানুষ জিন সবার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখুন।' হাফেয ইবনে হাজার র. 'আল-ইসাবা' গ্রন্থে একথা বর্ণনা করেছেন।

সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে হযরত মু'আয ইবনে জাবালের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে বিস্তর বর্ণনা রয়েছে। এখানে আমরা বিচারকের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানোর সময়ে রসূল স. তাকে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন এ বিষয়টি আলোচনা করবো।

ইমাম আবু দাউদ তাঁর সংকলিত সুনান আবু দাউদের কিতাবুল আকযিয়ার বাবু ফি ইজতিহাদির রাই-ফিল কাযাই'তে এবং ইমাম তিরমিযী তাঁর সংকলিত কিতাব তিরমিযী শরীফের কিতাবুল আহকাম বাবু মা জাআ ফিল কাযী কাইফা য়াকযীতে হারেস ইবনে আমর ইবনে আখিল মুগিরা ইবনে শু'বা থেকে এবং তিনি হযরত মু'আয ইবনে জাবাল থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন যারা তাঁর সাথে হিমস্ এলাকায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রসূল স. যখন মুআযকে ইয়েমেনের বিচারক করে পাঠাচ্ছিলেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কাছে যদি কোন মোকদ্দমা পেশ করা হয় তাহলে তুমি কিভাবে ফয়সালা করবে? জবাবে মুআয বললেন, আল্লাহর কিতাবের সাহায্যে ফয়সালা করব। রসূল স. জিজ্ঞেস করলেন, যদি আল্লাহর কিতাবে তোমার ফয়সালা না পাও? সুন্নাহ মোতাবেক ফয়সালা করব। রসূল স. আবার জিজ্ঞেস করলেন, যদি কিতাবুল্লাহ ও রসূলের সুন্নাহ উভয়টির মধ্যে তোমার ফয়সালা না পাও তাহলে কি করবে? মু'আয জবাবে বললেন, আমি কিতাবুল্লাহ ও রসূলের সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজতিহাদ করব। তাতে কোন ধরনের অবহেলা করব না।' মু'আযের এ কথায় রসূল স. বললেন, 'সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি তাঁর রসূলের প্রতিনিধিকে এমন কথা বলার তৌফিক দিয়েছেন যাতে তাঁর রসূলও সন্তুষ্ট।

২. এ ঘটনা সাক্ষ বহন করে যে, রসূল স. এর জীবদ্দশাতেই হযরত মু'আয ইয়েমেনে বিচার করতেন। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল ১৭ হিজরী সনে সিরিয়ায় পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের সময় তার বয়স হয়েছিল চৌত্রিশ বছর।

৩. আলা ইবনুল হাদরামী রা.

নাম ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আম্মাদ ইবনে আকবার ইবনে রবীআ আল হাযরামী রা.। তাঁর পিতা ছিলেন মক্কার অধিবাসী। আবদুল্লাহর পিতা আম্মাদ আবু সুফিয়ানের পিতা হারব ইবনে উমাইয়ার মিত্র ছিলেন। তার কয়েকজন ভাই ছিল। এর মধ্যে আমর ইবনে আল হাযরামী ছিল মুশরিকদের মধ্যে মুসলমান কর্তৃক প্রথম নিহত ব্যক্তি। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও তাঁর সঙ্গীরা আমরকে (হত্যা নিষিদ্ধ) আশহুরুল হারামে (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে হত্যা করেন। নিষিদ্ধ মাসে মুসলমান কর্তৃক এই হত্যাকাণ্ডকে কুরাইশরা ব্যবহার করে মুশরিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ করে তোলার জন্যে ব্যাপক অপপ্রচার চালায়। কুরাইশরা বলে, মুহাম্মদ স. ও তার অনুসারীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত মাসে রক্তপাত ঘটিয়ে পবিত্র মাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। তারা এই পবিত্র সময়ও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, লুটতরাজ করেছে, আমাদের লোকজনকে পাকড়াও করে আটকে রেখেছে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন–

'পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, বল-এতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা আল্লাহকে অস্বীকার করা মসজিদুল হারামে (প্রবেশে) বাধা দেয়া এবং এর বাসিন্দাকে তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর কাছে (রক্তপাতের চেয়েও) গুরুতর অন্যায়। ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়। তারা সব সময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে বিমুখ করতে পারে। তোমাদের মধ্যে যে দীন থেকে ফিরে যায় এবং কাফের হিসেবে মারা যায়, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়, এরাই আগুনের অধিবাসী সেখানে এরা অনন্তকাল থাকবে।'[৩]

এ আয়াত নাযিল হওয়ার ফলে কাফেরদের প্রচার প্রোপাগাণ্ডায় মুসলমানদের মধ্যে যে পেরেশানী সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় আলা আল হাযরামী ইসলাম গ্রহণ করেন। আলা আল হাযরামী ছিলেন মুস্তাজাবুদ্ দুআ।[৪] সাধারণত তিনি দুআ করলে তা আল্লাহ্ তাআলা কবুল করে নিতেন। দু'আ পড়তে পড়তে তিনি সমুদ্রে নেমে পড়তেন। সাহাবীদের মধ্যে সায়েব ইবনে ইয়াযীদ এবং আবু হুরায়রা রা. তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রসূল স. তাঁকে বাহরাইনের বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। এবং এ মর্মে তার উদ্দেশে একটি দীর্ঘ নির্দেশিকা লিখিয়েছিলেন। হারেস ইবনে উসামা রা. তাঁর মুসনাদে এটি সংকলন করেছেন।[৫] দীর্ঘ সেই নির্দেশিকার শুরুটা ছিল এমন–

'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। এটি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ নবীউল উম্মী আল কুরাইশী আল হাশেমী যিনি সকল মানব জাতির জন্যে আল্লাহর প্রেরিত রসূল ও নবী তাঁর পক্ষ থেকে আলা ইবনে আল হাযরামী ও তার সহযোগী মুসলমানদের জন্যে শপথনামা।

হে মুসলমানগণ, যথাসম্ভব প্রত্যেকের অন্তরে আল্লাহর তাকওয়া সৃষ্টি করো। 'আলা ইবনে আল হাযরামীকে আমি তোমাদের কাযী নিযুক্ত করেছি। আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি সে যেন আল্লাহকে ভয় করে, তোমাদের সাথে সদাচার করে এবং ভদ্রোচিত ব্যবহার করে। এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ন্যায় বিচার করে। আমি তাকে নির্দেশ দিচ্ছি সে তোমাদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে, তোমাদের প্রতি সদয় থাকবে এবং আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আদল ও ইনসাফ করবো আমি তোমাদের হুকুম দিচ্ছি যতক্ষণ সে এমনটি করবে ততক্ষণ তোমরা তার আনুগত্য করবে, তার কথা মানবে এবং তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। আমার আনুগত্যের অধিকার তোমাদের উপর এতো বেশি যে, তোমরা সেই অধিকার যথাযথ আদায় করতে সক্ষম হবে না।'

এটি সেই দীর্ঘ ঐতিহাসিক চিঠির একটি অংশ যা রসূল স. এর নির্দেশে হযরত উসমান রা. হযরত আলী রা. কে দিয়ে লিখাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় রসূল স. তাদের কাছে এলেন এবং চিঠিটি যখন তিনি আলা ইবনে আল হাযরামী ও খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে হস্তান্তর করছিলেন তখন হযরত আবু যার গিফারী, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান সাদ ইবনে আব্বাদ আল আনসারী প্রমুখ হাজির ছিলেন। রসূল স. খালিদকে আলা ইবনে আল হাযরামীর ডেপুটি নিযুক্ত করেন। যাতে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিপতিত হলে তিনি কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।

বিশেষ বৈশিষ্টমণ্ডিত সেই চিঠিতে ছিল দুনিয়া ও আখেরাতের অনেক কল্যাণ, শরীয়তের বিভিন্ন বিধানাবলী এবং রসূল স. এর পক্ষ থেকেও ছিল মূল্যবান হিদায়েত। এখানে শুধু বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশটুকুই উদ্ধৃত করা হয়েছে।[৬]

হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার রা.

নাম ঃ আবু-আ'লা কারো কারো মতে আবু আবদুল্লাহ, মালমুযানী তাঁর উপনাম। হযরত উসমানের রা. মাতা মুযানিয়্যার দিকে মুযানী শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। হুদায়বিয়া সন্ধির আগে হযরত মা'কিল ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বাইয়াতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক বাগভী বলেন, হযরত উমর রা. এর নির্দেশে তিনি বসরায় একটি খাল খনন করিয়েছিলেন যেটির নামকরণ করা হয় নহরে মা'কিল। হযরত মা'কিল বসরাতেই বসতি স্থাপন করেছিলেন। হযরত মুআবিয়ার শাসনামলে বসরাতেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি রসূল স.-সহ নু'মান ইবনে মুকরিন ইমরান ইবনে হাসীন, আমর ইবনে মায়মুন আলওয়াতী আবু উসমান আন নাহদী, হাসান বসরী রা. থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। মা'কিল বর্ণিত হাদীস সুনান ও সিহাহ মর্যাদার কিতাবগুলোতে পাওয়া যায়।

হযরত মা'কিলও ছিলেন রসূল স. কর্তৃক নিযুক্ত বিচারকদের একজন। ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে এবং ইমাম হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে বর্ণনা করেছেন, হযরত মা'কিল বলেন, আমাকে রসূল স. জনগণের বিচার করার নির্দেশ দেন। আমি আরয করলাম আমার মধ্যে সঠিক ফয়সালা করার যোগ্যতা নেই। রসূল স. বলেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত বিচারকদের প্রতি আল্লাহর মদদ ও সহযোগিতা থাকে যতোক্ষণ স্বেচ্ছায় মানুষের উপর অন্যায় অবিচার না করে।[৭]

অন্যান্য সাহাবীদের বর্ণনা দ্বারাও এই হাদীসের সাক্ষ পাওয়া যায়। তাবরানীতে জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য সেখানে এ শব্দগুলো কম রয়েছে যে, 'যতোক্ষণ পর্যন্ত বিচারক আল্লাহ ছাড়া আর কারো সন্তুষ্টিকে লক্ষে পরিণত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথেই পরিচালিত করেন। (মুসনাদে আহমদ ৫ : ২৬)

তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আউস থেকে বর্ণিত, রসূল স. বলেন, 'যতোক্ষণ পর্যন্ত বিচারক জুলুম না করে ততোক্ষণ তার প্রতি আল্লাহর সহযোগিতা থাকে তার প্রতি, বিচারক যখন জুলুম করতে শুরু করে তখন আল্লাহ তার সহযোগিতা ত্যাগ করেন, শয়তান তার লাগামকে টেনে ধরে।[৮]

আমর ইবনুল আ'স আল কুরাশী রা.

নাম ঃ আবু আবদুল্লাহ অথবা আবু মুহাম্মদ আস-সাহমী। মক্কা বিজয়ের আগে অষ্টম হিজরীর সফর মাসে ইসলাম গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধি ও খায়বার বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। যুবায়ের ইবনে বাক্কার ও ওয়াকেদী তাদের গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন, হযরত আমর ইবনুল আস হাবশায় নাজ্জাশীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। যুবায়ের ইবনে বাক্কার বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আমরকে বলল, বিচার বুদ্ধির দিক থেকে আপনিই আপনার উদাহরণ। তারপরও আপনি ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে এতো বিলম্ব করলেন কেন? আমর বলেন, আমি এমন লোকদের সাথে ছিলাম যারা আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা ছিল

আন্তরিকভাবে নানা সন্দেহ ও সংশয়ে নিমজ্জিত। রসূলের আবির্ভাবের পর তারা রসূল স.-কে মিথ্যাবাদী মনে করল, বাধ্য হয়ে তখন আমাকেও তাদের সমমনা থাকতে হয়েছিল। এদের মৃত্যুর পর পরিস্থিতি যখন আমার নিয়ন্ত্রণে চলে এল তখন বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলাম, ইসলাম আমাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে আমরা ইসলামের দাওয়াত কবুল করে নিলাম। আমার এই ব্যাপারটি পরবর্তীতে কুরাইশরাও অনুভব করতে পারলো। কেননা ইসলাম গ্রহণের পর আমি আর আগের মতো তাদের সহযোগিতায় আগ্রহবোধ করতাম না। ফলে তারা এক যুবককে এ ব্যাপারে আমার সাথে আলোচনা করার জন্যে পাঠালো। আমি কুরাইশদের প্রেরিত যুবককে বললাম, 'তোমাকে আমি সেই প্রভুর কসম দিয়ে বলছি যিনি তোমার ও আমার রব এবং তোমার আগের ও পরের সব মানুষেরই রব, বলতো আমরা যে দীনের উপর আছি সেই দীন কী সবচেয়ে ভালো না রোম ও পারস্যবাসী যে দীনের উপর আছে তা বেশি ভাল?
সে বললো, আমরাই হেদায়েত প্রাপ্ত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা বেশি সুখে আছি না রোম পারস্যবাসী? সে বলল, ওরা আমাদের চেয়ে বেশি খোশহালে আছে? তাহলে আমরা কিসের ভিত্তিতে তাদের চেয়ে ভালো হলাম, এই দুনিয়াতেই যদি আমাদের অবস্থা তাদের চেয়ে ভালো না হয়। অথচ বাহ্যিক ও পার্থিব দৃষ্টিতে প্রত্যেক দিক থেকেই ওরা আমাদের চেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে। একটা কথা শোন; আমার মন এটাকে সমর্থন করে মুহাম্মদ স. বলে যে, মৃত্যুর পর মানুষকে আবার জীবন্ত করা হবে তখন নেককারদেরকে তাদের নেক কাজের পুরস্কার দেয়া হবে এবং বদকারদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। বস্তুত একটা ভ্রান্তির ভেতরে সময় কাটিয়ে দেয়ার মধ্যে আমি কোন মঙ্গল দেখি না।'
হাফেজ ইবনে হাজার 'আল ইসাবা' গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণনা করেন।
হযরত আমর ইবনুল আস ছিলেন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের একজন। তাঁর মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। আমর ইবনুল আস ছিলেন মিসর ও কিন্নাসরীণ বিজয়ী এবং ফিলিস্তিনের গভর্নর। তিনি তৎকালীন আরবের একজন জ্ঞানী দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। সিফফিন যুদ্ধের পর হযরত মুআবিয়া হযরত আমরকে সালিশ মনোনীত করেছিলেন। হযরত আমর ইবনুল আসকে বিচারক নিযুক্ত করে রসূল স. যে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন, তা ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে সংকলন করেছেন যে, আবু নসর ফরজ থেকে ফরজ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা থেকে তিনি তার পিতা থেকে আবদুল আ'লার পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণনা করেন, বিবদমান অবস্থায় দু'জন লোক রসূল স. এর কাছে এলে তিনি বললেন, আমর! তুমি এদের ফয়সালা করে দাও। আমর বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, এ কাজ আমার চেয়ে আপনিই ভালো করতে পারবেন। রসূল স. বললেন, তোমার করতে অসুবিধা কি? আমি বললাম, যদি আমি এদের মধ্যে ফয়সালা করে দেই তাতে আমার কি লাভ? তখন তিনি বললেন, 'যদি তুমি তাদের মধ্যে ফয়সালা সঠিকভাবে করতে পারো, তাহলে তুমি পাবে দশটি সওয়াব আর যদি ফয়সালা করতে গিয়ে ভুল কর তাহলে তুমি পাবে একটি সওয়াব।

এক্ষেত্রে রসূল স. তাকে ফয়সালা করতে নিষেধ করেননি বরং সঠিক ফয়সালা করতে সচেষ্ট হওয়ার জন্য এমন প্রতিদানের কথা বললেন যাতে বিচারক সঠিক ফয়সালা দেয়ার প্রতি যত্নবান হয়। কুরআনে কারীমে নিম্নোল্লেখিত আয়াতও রসূল স. এর কথাকেই সমর্থন করে। 'যে কোন ভালো কাজ করবে সে দশ গুণ সওয়াব পাবে।' (সূরা আনআম: ১৬০)
উল্লেখ্য 'যদি বিচারক ফয়সালা করার ক্ষেত্রে ভুল করে তাহলেও একটি সওয়াব দেয়া হবে' কথার মর্মার্থ এই নয় যে, ভুল করেছে বলে একটি সওয়াব দেয়া হবে, বরং ফয়সালা করার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বিচারে কোন ত্রুটি করেনি এজন্য তাকে একটি সওয়াব দেয়া হবে। অবশ্য সেই বিচারকই সওয়াবের অধিকারী হবে যে বিচারক কুরআন ও সুন্নাহর বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত এবং মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোতে তার ইজতিহাদ করার মতো মেধা ও প্রজ্ঞা রয়েছে। কুরআন হাদীস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং ইজতিহাদ করার মতো প্রজ্ঞার অধিকারী নয় এমন ব্যক্তি যদি বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হয় তার বেলায় রসূল স. এর সেই হুঁশিয়ার বাণী প্রযোজ্য। রসূল স. বলেন, বিচারক (কাযী) তিন ধরনের। তন্মধ্যে এক ধরনের বিচারক আছে, যে পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়াই বিচার করে, সেসব বিচারক জাহান্নামের অধিবাসী হবে যদিও তাদের ফয়সালা সঠিক হয়।
বিশুদ্ধ বর্ণনামতে আমর ইবনুল আস ৪৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। হাফেজ ইবনে হাজার এ মতকে সমর্থন করেছেন।

উকবা ইবনে আমের রা.

উকবা ইবনে আমের আল জুহানী একজন প্রখ্যাত সাহাবী। রসূল স. থেকে সরাসরি অধিকাংশ হাদীস তিনি রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর কাছ থেকে ইবনে আব্বাস, আবু উমামা, যুবায়ের ইবনে নুফায়ের, রাজা বিন আবদুল্লাহ আল জুহানী, আবু ইদরিস খাওলানী প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। উকবা ইবনে আমের কুরআন ও ফিকহের বিশেষ করে উত্তরাধিকার আইনে খুবই উঁচুমানের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সাহিত্যে শিখর স্পর্শকারী কবি ও কাতেব ছিলেন। তিনি ছিলেন সেই মহান কয়েকজনের একজন যাঁরা কুরআন সংকলন করেছিলেন।
একবার দু'জন লোক বিবদমান অবস্থায় রসূল স. এর কাছে এলে তিনি তাদের বিচার করার জন্যে উকবা ইবনে আমেরকে নির্দেশ দেন। ইমাম দারা কুতনী নিজের সূত্রে উকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণনা করেন, দু'জন লোক ঝগড়ারত অবস্থায় রসূল স. এর দরবারে হাজির হলো। রসূল স. নির্দেশ দিলেন, 'উকবা উঠো, তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দাও।' উকবা বলেন, আমি বললাম, আপনি এ কাজ আমার চেয়ে সুন্দর মতো করতে পারবেন। রসূল স. বললেন, এদের বিবাদ মিটিয়ে দাও, তুমি যদি সঠিক ফয়সালা দিতে পারো তাহলে দশটি সওয়াব পাবে, আর তুমি যদি তাদের বিরোধের ব্যাপার নিয়ে ইজতিহাদ করো এবং তাতে ভুল করো তাতেও তুমি একটি সওয়াব পাবে।
এই হাদীসের সনদে আবুল ফারাজ ইবনে ফুদালা নামক রাবী দুর্বল। তবে হাদীসের বক্তব্য ও মর্মার্থ সঠিক। আরো কয়েকটি সূত্রেও এ হাদীসটি আবু হুরায়রা ও অন্যদের বরাতে বর্ণিত হয়েছে।

৭. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামা আল-আব্‌সী রা.

শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের মধ্যে হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামানকেও গণ্য করা হয়। রসূল স. সূত্রে তাঁর কাছ থেকে হযরত জাবের, জুনদুব, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ, আবু তোফায়েলসহ বহু তাবেয়ী বহু সংখ্যক হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। হযরত হুজায়ফা রসূল স. এর একান্ত গোপন বিষয় জানার ব্যাপারে বিখ্যাত ছিলেন। হযরত উমর রা. তাঁর কাছ থেকে দুনিয়াতে ঘটিতব্য বিভিন্ন ফিতনা সম্পর্কে অবহিত হতেন। হুজায়ফা যদি কারো জানাযায় শরীক হতেন তবে উমরও তাতে শরীক হতেন আর হুজায়ফা কারো জানাযায় শরীক না হলে উমরও তাতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন। বহু বর্ণনায় তার মর্যাদা ও অবস্থানের বিবরণ রয়েছে।

দু'জন লোকের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্যে রসূল স. হযরত হুজায়ফাকে ইয়ামামা পাঠিয়ে ছিলেন। ইবনে শাবান লিখেন, দুই ব্যক্তি টিলার উপরের একটি ছোট বাগিচা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে রসূল স. এর কাছে এলো।

ইমাম নাসাঈ কিতাবুস সুকনায় উল্লেখ করেছেন, ইয়ামামার অধিবাসী দুই ব্যক্তি একটি বাগিচা নিয়ে ঝগড়া করে রসূল স. এর কাছে এলো। রসূল স. তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামানকে পাঠালেন। হুজায়ফা সরেজমিন তদন্ত করে সেই ব্যক্তির পক্ষে ফয়সালা দিলেন যার অবস্থান ছিল সীমান্ত রশির কাছাকাছি। রশিটির সাথে একটি ঝুপড়ি ঘর বাঁধা ছিল। অতপর তিনি রসূল স. এর দরবারে হাজির হয়ে তার ফয়সালা সম্পর্কে জানালে রসূল স. বললেন, তুমি সঠিক ফয়সালা করেছো।

ইমাম দারা কুতনী এ হাদীসটি দাহশাম ইবনে কিরান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যিনি একজন দুর্বল রাবী। ইমাম ইবনে মাজা নিমরান ইবনে জারিয়া সূত্রে এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন কিন্তু নিমরান একজন মজহুল রাবী।

৮. আত্‌তাব ইবনে উসায়েদ রা.

নাম ঃ আত্‌তাব ইবনে উসায়েদ ইবনে আবুল ইয়াস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস্ উমাবী। তাঁর উপনাম আবু আবদুর রহমান অথবা আবু মুহাম্মদ। তার মায়ের নাম যয়নাব বিনতে আমর ইবনে উমাইয়া।

মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি ছিলেন স্বভাবজাত বিনয়ী ভদ্র ও উন্নত স্বভাবের অধিকারী। ইসলাম গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল বিশ বছরের কিছু বেশি। আল মাওয়ারদী লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের পর রসূল স. আত্‌তাব ইবনে উসায়েদকে শাসক ও বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। আত্‌তাবের উদ্দেশে রসূল স. বলেন, হে আত্‌তাব! যে পণ্য তাদের কব্জায় নেই এমন পণ্যের কেনাবেচা থেকে মানুষকে বিরত থাকতে বল। আর যে জিনিসের দায়-দায়িত্ব বা ভর্তুকি স্বীকার করেনি এমন জিনিসের উপকার ভোগ করা কিংবা লাভ গ্রহণ করা থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ দাও।'[৯] আল খাওয়ারেজমী আবু হানিফা থেকে ইয়াহয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে

মাওহাব আত্‌তামিমী আল কুরাশী আল কুফী সূত্রে আমের আশ্‌শাবী থেকে আত্‌তাব ইবনে উসায়েদ সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করীম স. তাকে নির্দেশ দেন, সে যেন তার কওমকে যেসব পণ্য তাদের কব্জায় নেই সেগুলো বিক্রি করা থেকে নিষেধ করে। তদ্রূপ একই ক্রয় বিক্রয়ে দুই ধরনের শর্তারোপ না করে। (যেমন নগদ মূল্য দিলে দাম এতো আর বাকিতে মূল্য পরিশোধ করলে মূল্য এতো?) সেই সাথে বিক্রেতা যেন এমন কোন জিনিস থেকে উপকার ভোগ না করে যার আমানতদারীর দায়িত্ব সে স্বীকার না করে। এমন কেনা বেচাকেও যেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যাতে ভবিষ্যতে দাম পরিশোধের ভিত্তিতে পণ্য নগদ হস্তান্তর করা হয়।[১০]

হযরত আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী করীম স. আত্‌তাব ইবনে উসায়েদকে মক্কার শাসক নিযুক্ত করেন, তিনি মুনাফেকদের প্রতি খুবই কঠোর এবং ঈমানদারদের প্রতি খুবই দয়া পরবশ ছিলেন। আত্‌তাব নিজেই বলতেন, 'কারো ব্যাপারে যদি আমি জানতে পারি, সে জামায়াতে নামায আদায় করে না, তাহলে আমি তাকে হত্যা করবো। কেননা, একমাত্র মুনাফেক ব্যক্তিই জামায়াতে নামায পড়া থেকে বিরত থাকে।'

মক্কার অধিবাসীরা রসূল স. এর দরবারে হাজির হয়ে বললো, আপনি একজন কর্কশ মেজাজের মানুষকে আমাদের শাসক নিযুক্ত করেছেন। তখন রসূল স. বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি, আত্‌তাব জান্নাতের দরজার সামনে এসে খুব জোরে দরজার জিঞ্জির ধরে টান দিল আর অমনি দরজাটি খুলে গেল এবং আত্‌তাব জান্নাতে প্রবেশ করল।' হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী 'আল ইসাবা' গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হযরত আবু বকর রা. যেদিন ইন্তেকাল করেন সেদিন হযরত আত্‌তাব রা.ও ইন্তেকাল করেন।[১১]

৯. দিহ্‌য়া আল-কালবী রা.

নাম ঃ দাহ্‌ইয়া ইবনে খলীফা ইবনে ফুরাদা। ফুজায়া গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত। শুরুর দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ফেরেশতা জিবরাঈল যখন মানুষের অবয়ব নিয়ে আসতেন তখন তার চেহারা সূরত অনেকটাই দিহ্‌য়াতুল কালবীর মতো দেখাতো।

ইবনে সাঈদ আনসার ও মুহাজেরদের দ্বিতীয় সারির আলোচনার মাঝামাঝি লিখেছেন, ইয়ালা ইবনে লাবীদ উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা এবং ফযল বিন হাকীম তাকে বলেছেন। তাদের কাছ থেকে যাকারিয়া ইবনে আবু যায়েদা হযরত আমের আশ-শাবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. তিনজনকে তিন জনের সঙ্গে তুলনা করছেন। তিনি বলেন,

১. দিহ্‌য়াতুল কালবী জিবরাঈল সদৃশ

২. উরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফী ঈসা ইবনে মারয়াম সদৃশ

৩. আবদুল উজ্জা তথা আবু লাহাব দাজ্জাল সদৃশ।

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, রসূল স. বলেন, মানুষের মধ্যে আমি জিবরাঈলকে দিহ্‌য়াতুল কালবীর সাথেই বেশি সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, 'দাহ্ইয়াতুল কালবীর অনুরূপ অবয়বেই জিবরাঈল রসূল স. এর কাছে আসতেন। রোমের কায়সারের কাছে রসূল স. এর পয়গাম বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দাহ্ইয়াতুল কালবী।
আলমাওয়ারদী লিখেছেন, দাহইয়াতুল কালবীকে রসূল স. ইয়ামানের একটি অঞ্চলের বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। চেহারা সূরতে তিনি ছিলেন জিবরাঈল আ. এর মতো।

১০. হযরত আবু মূসা আশআরী রা.

নাম ঃ আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস। উপনাম আবু মূসা। আশআর গোত্রের লোক ছিলেন। নাম ও উপনামে সমান পরিচিত ছিলেন। তার উপনামটিই বরং বেশি খ্যাত ছিল। তার মায়ের নাম তায়েবা বিন ওয়াহাব বিন আল। রামলা নামক স্থানে আবু মূসা বসতি গেড়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন সাঈদ ইবনুল আস-এর ঘনিষ্ঠ মিত্র। ইসলাম গ্রহণের পর হাবশায় হিজরত করেন। অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণের পর হাবশায় হিজরত করেননি, তার জন্মভূমি ইয়ামানে চলে গিয়েছিলেন। এ কারণেই মূসা বিন উকবা, ইবনে ইসহাক, ওয়াকেদী ও অন্যান্য সীরাত লেখকগণ তাকে হাবশায় হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। খায়বর বিজয়ের পর তিনি মদীনায় পদার্পণ করেন। ঘটনাক্রমে জাফর ইবনে আবু তালেবের নৌকার পাশাপাশি তার নৌকাও তীরে ভিড়েছিল। আল্লামা ওয়াকী 'আখবারুল কাযা' গ্রন্থে লিখেছেন, কেউ কেউ বলেন, রসূল স. আবু মূসাকে ইয়ামানের শাসক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। আর কেউ বলেন, তাঁকে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার 'আল ইসাবা' গ্রন্থে লিখেন, আবু মূসা আশআরীকে রা. রসূল স. ইয়ামানের যোবায়েদ, আউন ও আশপাশের এলাকার প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত উমর রা. মুগীরার পর তাকে বসরার প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। অতপর তিনি প্রথমে আহওয়াযান এবং ইস্পাহান জয় করেন। হযরত উসমান রা. তাঁর খেলাফতের সময় আশআরীকে কুফার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। হযরত আলী সিফফীন যুদ্ধে তাকে সালিশ মনোনীত করেছিলেন।
হযরত আবু মূসা রসূল স. খোলাফায়ে রাশেদীন, মুআয, ইবনে মাসউদ, উবা'ই ইবনে কা'ব ও আম্মার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার কাছ থেকে তাঁর ছেলে মূসা, ইবরাহীম, আবু বুরদা, আবু বকর ও তার স্ত্রী উম্মে আবদুল্লাহ প্রমুখ হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি ষাটোর্ধ্ব বয়সে ৪২ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

১১. উমর ইবনুল খাত্তাব রা.

নামঃ উমর ইবনুল খাত্তাব ইবনে নুফায়েল আল কুরাশী আল আদাবী। উপনাম আবু হাফস। ফিজার যুদ্ধের চার বছর পরে এবং রসূল স. এর নবুয়ত প্রাপ্তির ত্রিশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক খলীফা তার নিজের সূত্রে বলেন, হযরত উমর আবাবিল কর্তৃক হস্তিবাহিনী ধ্বংসের তের বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। জিহালতের সময় কুরায়শের বহিঃযোগাযোগের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল। নবুয়ত প্রাপ্তির পর রসূল স. যখন ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন তখন

মুসলমানদের প্রতি তার মনোভাব ছিল খুবই কঠোর কিন্তু আল্লাহর রহমতে অচিরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল মুসলমানদের জন্যে একটি বিরাট সাফল্য।

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, হযরত উসমান আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে নির্দেশ দেন, 'যাও লোকদের বিচার করো। আবদুল্লাহ আরয করলেন, আমীরুল মুমিনীন! এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমাকে মাফ করুন। উসমান বললেন, এমন কাজ করতে তুমি অস্বীকৃতি জানাচ্ছো, অথচ তোমার পিতা মানুষের বিচার করতেন।'

ইবনুল আরাবী বলেন, 'হযরত উসমানের এই কথা 'তোমার পিতা মানুষের বিচার করতেন' বলার উদ্দেশ্য ছিল হযরত উমর রসূল স. কর্তৃক নিযুক্ত বিচারক ছিলেন।'

১২. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.

উবাই ইবনে কা'ব ছিলেন সাইয়েদুল কুররা তথা কুরআন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দ্বিতীয় বাইআতে আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের একজন। তিনি বদরসহ সকল গাযওয়ায় (রসূল স. যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন) অংশগ্রহণ করেছিলেন। রসূল স. তাকে বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন।

১৩. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী আল খাযরাজী রা.

যায়েদ ইবনে সাবেত ছিলেন কাতেবীনে ওহীদের (ওহী লেখক সাহাবী) একজন। উত্তরাধিকার বিধান সম্পর্কে তিনি ছিলেন সবচেয়ে অভিজ্ঞ সাহাবী। রসূল স. তাকেও বিচারকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ছিলেন এমন একজন সাহাবী যার সম্পর্কে রসূল স. বলেছিলেন, 'কেউ যদি কুরআন কারীমকে যেভাবে নাযিল হয়েছে ঠিক তেমন মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে পড়তে চায় সে যেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতো করে কুরআন তেলাওয়াত করে। ইবনে সা'দ তাকে মুফতী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, মদীনায় বিচারক ও ফাতওয়ার ক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ একটা মর্যাদাজনক অবস্থান লাভ করেছিলেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাসরূক এই তিন সাহাবীকে রসূল স. এর বিচারকদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল কাত্তানী তাবারীর উদ্ধৃতিতে মাসরূকের অভিমত সংকলন করেছেন।[১২]

তথ্যপঞ্জি

১. সূরা নিসা আয়াত ৬৫।

২. ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান বলেছেন। হাকেম বলেছেন হাদীসটি সনদের দিক থেকে সহীহ কিন্তু বুখারী ও মুসলিম এ হাদীসটি সংকলন করেননি। হাফেয যাহবী হাকেমের এই অভিমত সমর্থন করেছেন। ইমাম বায়হাকী আস-সুনানুন কুবরা এবং আবু দাউদ তার

মুসনাদে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন। তাদের সবার রেওয়ায়েতে হানাশ ইবনুল মু'তাসির আল-কিনানী আল কুফী নামের যে রাবী রয়েছেন তিনি ছিলেন হযরত আলীর সঙ্গী। ইমাম মুনযেরী মুখতার আবু দাউদে লিখেছেন, তিরমিযী তাকে হাসান পর্যায়ের রাবীর মর্যাদা দিয়েছেন। হাফেয ইবনে হাজার 'আত্-তাকরীব' গ্রন্থে লিখেছেন, হানাশ ভালো লোকই ছিলেন কিন্তু কিছুটা সংশয়ে ভুগতেন। ইবনে হায্ম এই রাবীকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। তিনি 'আলমুহাল্লা' (১০:৫১৯) গ্রন্থে লিখেন, এই রাবী মানোত্তীর্ণ নন। উল্লেখ্য ইমাম ইবনে হাযম সূত্র পর্যালোচনায় খুবই কঠোর বলে খ্যাত।

এই বর্ণনার সমর্থনে অন্যান্য রেওয়ায়েতও রয়েছে। ইবনে মাজা, হাকেম ও বায্যার বুখতারী আলী থেকে এ রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু বাখতারীর কখনো আলীর সাথে সাক্ষাত হয়নি। এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস শোনার সুযোগ হয়নি। আবু হাতেম ও অন্যরা বলেন, এই রাবীর নাম ছিল সাঈদ ইবনে ফিরোজ। বাযযার অন্য এক সনদে (হারেস ইবনে মুআররাব আলী হতে) রেওয়ায়েত করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার বলেন, আলীর সূত্রে এটিই ভালো রেওয়ায়েত। ইবনে হাজার এ কথাও বলেন, অন্য একটি সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অন্য একটি সূত্র হাশেম ইবনে আব্বাস থেকেও এই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। হযরত আলী বলেন, আমাকে রসূল স. ইয়েমানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, মানুষকে দীনের শিক্ষা দেবে এবং তাদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করবে। (দেখুন, আদদিরায়া ২,১৬৫)

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বহু সূত্র পরম্পরায় এ হাদীসটি বিশুদ্ধ।

৩. সূরা বাকারা-আয়াত ২১৭।

৪. 'মুস্তাজাবুদ দুআ' মানে যার সম্পর্কে জনসমাজে এমন বিশ্বাস থাকে যে তিনি দুআ করলে কবুল হয়। (অনুবাদক)

৫. তিরমিযী এ হাদীসটি সংকলন করে বলেন, এই সনদ ছাড়া এ হাদীসটির আর কোন সনদ জানা নেই। কিন্তু তার দৃষ্টিতে এ হাদীসটির উল্লেখিত সনদ মুত্তাসিল।

বর্ণিত হাদীসটির সনদের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ তো এর সনদের পর্যালোচনায় স্বতন্ত্র কিতাবই লিখে ফেলেছেন। কারণ এই হাদীসটির উপর কেন্দ্র করেই শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি কিসাসের বৈধতা সাব্যস্ত হয়। আমার দৃষ্টিতে (গ্রন্থকার) এ ব্যাপারে সবচেয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন হাফেয ইবনে কাইয়েম তার 'ইলামুল মুকিয়ীন' গ্রন্থে। (১ : ২০২) ইবনে কাইয়েম বলেন, এই সনদে হযরত মুআযের অন্যান্য সাথীদের নাম উল্লেখ করা হয়নি যারা তার সাথে ছিলেন, তাতে এই হাদীসের গুরুত্ব মোটেও হ্রাস পায় না। কেননা, হারেস বিন আমর এ হাদীস শুধু একাকী মুআয নয় আরো অনেকের কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, যাদের প্রত্যেকের সততা বিশ্বস্ততা মর্যাদা ও খ্যাতি এতোটাই প্রতিষ্ঠিত

যে তাদের কারো বেলায় মিথ্যা কিংবা এ ধরনের কোন অভিযোগ করার অবকাশ নেই। তাদের কারো ব্যাপারেই আলেমদের মধ্যে কোন আপত্তি নেই এবং তাদের কেউ কোন ধরনের ত্রুটিযুক্ত নন।

৬. হাফেয ইবনে হাজার 'আল মাতালিবুল আলীয়ায় (২ : ২৩৭) এই চিঠিটি উল্লেখ করেছেন। হিজরী সনের ৩রা যিলকাদ তারিখে রসূল স. এই চিঠি লিখিয়েছিলেন। আবু সীরী র. দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। কারণ যে তাবেয়ী থেকে এই হাদীস রেওয়ায়েত করা হয়েছে তিনি একজন মাজহুল ব্যক্তি।

৭. দেখুন কানযুল উম্মাল পৃ. ৫০-৯৬।

৮. তিরমিযী শরীফের কিতাবুল আহকাম : বাবু মা জাআ ফিল ইমামিল আদিল-এ ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব। শায়খ মোবারকপুরী 'তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থে (৪ : ৫৬) লিখেছেন, ইমাম হাকেম মুসতাদরাকে এবং ইমাম বায়হাকী সুনানুন কুবরায় এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। আল মুনাবী শরহে আল জামেউস সাগীর গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম হাকেম এ হাদীসটিকে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন।

৯. আদাবুল কাযী লিল মাওয়ারদী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩১।

১০. মুসনাদে আবু হানিফা খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭০৬।

১১. আদাবুল কাযী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩২।

১২. দেখুন আত্-তারতিবিল ইদারিয়া খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫৮।

অনুবাদ : আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, পৃষ্ঠা : ৪৮-৬১

রিবা (সুদ) অর্থনীতির একটি ধ্বংসাত্মক উপাদান

মুহাম্মদ মূসা

সংগা

ইসলামী আইন ও ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় রিবা (সুদ) অর্থব্যবস্থার একটি ধ্বংসাত্মক উপাদান। তাই অর্থনৈতিক লেনদেনে ও আদান-প্রদানে রিবা-কে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'আধিক্য', 'পরিবৃদ্ধি', 'পরিবর্ধন', 'বিকাশ', 'উপরে আরোহণ' ইত্যাদি। যেমন রাবা আর-রাবিয়া (সে টিলায় আরোহণ করলো), রাবা আস-সাবীক (সে ছাতুর মধ্যে পানি ঢাললো এবং তা ফুলে উঠলো, স্ফীত হলো), রাবা ফী হাজরিহি (সে তার কোলে লালিত-পালিত হয়ে বিকশিত হলো), আরবা আশ-শায় (সে জিনিসটি বৃদ্ধি করেছে) ইত্যাদি।

কুরআন মাজীদেও 'রিবা' শব্দটি এসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ 'অতঃপর তাতে (শুষ্ক ভূমিতে) পানি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হলো'।[১] 'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত (ইউরবী) করেন'।[২] প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে, এভাবে আবর্জনা উপরে (রাবিয়ান) আসে'।[৩] 'তিনি তাদের আরো শক্ত করে (রাবিয়ান) পাকড়াও করেন'।[৪] 'যাতে একদল অপর দল অপেক্ষা অধিক লাভবান (আরবা) হয়'।[৫] মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে (লিইয়ারবু) বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা সম্পদ বৃদ্ধি (ইয়ারবু) করে না'।[৬]

ফাতাওয়া আলামগীরীতে সুদের নিম্নোক্ত সংগা প্রদান করা হয়েছে ঃ 'শরীয়তে সুদ সেই মালকে বলা হয় যা মালের পরিবর্তে মালের লেনদেনকালে অতিরিক্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং যার কোন বিকল্প বা প্রতিকল্প ('ইওয়াদ) নেই'।[৭] 'একই প্রজাতির কোন জিনিসের পারস্পরিক লেনদেনের সময় কোন প্রতিদান ব্যতীত এক পক্ষ কর্তৃক যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করা হয় সেই অতিরিক্ত অংশকে সুদ বলে'।[৮] 'শরীয়ত সম্মত বিনিময় ছাড়াই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যে বর্ধিত মাল গ্রহণ করা হয় তাকে সুদ বলে।[৯] 'চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষের মধ্যে যে কোন পক্ষ শর্ত মোতাবেক লেনদেনের শরীয়ত সম্মত বিনিময় ছাড়াই যে বর্ধিত মাল অপর পক্ষকে প্রদান করে তাকে সুদ বলে'।[১০] যেমন এক মণ ধানের বিনিময়ে দেড় মণ ধান গ্রহণ করা হলে অতিরিক্ত অর্ধ মণ ধান সুদ হিসেবে গণ্য হবে। অথবা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে এক মাসের জন্য এই শর্তে এক শত টাকা ঋণ প্রদান

লেখক : সহকারী সম্পাদক, ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার; সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সংস্থার কর্মকর্তা।

করলো যে, মেয়াদ শেষে সে ঋণদাতাকে এক শত বিশ টাকা প্রদান করবে। এখানে অতিরিক্ত বিশ টাকা সুদ হিসেবে গণ্য।

সুদ ভিত্তিক লেনদেন নিষিদ্ধ

ইসলামী শরীয়তে সুদ হারাম এবং লেনদেনের চুক্তিতে সুদ প্রদানের শর্ত থাকলে উক্ত চুক্তি বাতিল গণ্য হবে, যা আইনত বলবৎযোগ্য নয়। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। কারণ তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং যে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না'।[১১]

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ত্যাগ করো, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। যদি তোমরা তা না ছাড়ো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা অত্যাচারও করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না'।[১২]

'হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো'।[১৩]

জাবির রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. অভিসম্পাত করেছেন– 'সুদখোরকে, সুদদাতাকে, সুদের হিসাব রক্ষককে এবং তার সাক্ষীদ্বয়কে। তিনি বলেছেন ঃ এদের সকলেই সমান অপরাধী'।[১৪]

রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ 'কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞাতসারে এক দিরহামও সুদ গ্রহণ করে তা ছয়ত্রিশ বার যিনা করার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ'। 'সুদের গুনাহর সত্তরটি স্তর রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক হালকা স্তর হলো– কোন ব্যক্তির নিজের মাকে বিবাহ করা'।[১৫] উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সুদ হারাম এবং অবশ্য বর্জনীয় প্রমাণিত হয়।

সুদের শ্রেণীবিভাগ

সুদের একাধিক শ্রেণীবিভাগ থাকলেও প্রধান শ্রেণী দুইটি ঃ (ক) রিবা আন-নাসিয়া ও (খ) রিবা আল-ফাদল।

(ক) রিবা আন-নাসিয়া বা মেয়াদী সুদ , যা বর্তমান কালেও ইসলাম-বিরোধী অর্থব্যবস্থায় সর্বাধিক প্রচলিত এবং কুরআন মজীদে সরাসরি এই প্রকারের সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই এর অপর নাম 'রিবা আল-কুরআন'। ইসলাম-পূর্ব জাহিলী যুগে উক্ত শ্রেণীটি সুদ বলে অভিহিত হওয়ায় এর অপর নাম 'রিবা আল-জাহিলিয়্যা'।

আবু বাক্‌র আল-জাসসাস র. বলেন, 'হুওয়াল কারদুল মাশরূত ফীহিল আজাল ওয়া যিয়াদাতু মালিন আলাল-মুসতাকরিদ' অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে অতিরিক্ত পরিমাণ মালসহ যে ঋণ ফেরত প্রদান করে তাকে 'রিবা আন-নাসিয়া বলে'।[১৬] একটি হাদীসেও অনুরূপ সংগা বর্ণিত আছে। আলী রা. বলেন, 'কুল্লু কারদিন জাররা মানফাতান ফাহুওয়া রিবা' (যে কোন ঋণের সাথে মুনাফা যুক্ত হলে বা যে ঋণ মুনাফা টানে সেই মুনাফা সুদ)।[১৭] প্রখ্যাত সাহাবী ফাদালা ইবনে উবাইদ রা. বলেন, 'কুল্লু কারদিন জাররা মানফাআতান ফাহুওয়া ওয়াজহুন মিন উজূহির রিবা' (যে কোন ঋণের সাথে মুনাফা যুক্ত হলে সেই মুনাফা এক ধরনের সুদ'।[১৮] আল-যাজ্জাজও অনুরূপ সংগা দিয়েছেন, 'কুল্লু কারদিন য়ুখাযু বিহি আকসারা মিনহু' (যে কোন ঋণের সাথে তার চেয়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করাই সুদ; (তাজুল আরূস, দ্র. শিরো. রিবা)। মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'আয-যিয়াদাতুল মাশরূতাতু মাকাবিলিল-আজালি খালিয়াতুন আন ইওয়াদ মাশরূত' (চুক্তির শর্ত মোতাবেক মেয়াদকালের বিপরীতে শরীয়ত সম্মত বিনিময় ছাড়াই যে বর্ধিত মাল প্রদান করা হয় তাকে রিবা আন-নাসিয়া বলে; পৃ. ২১৮)।

কোন কোন আধুনিকপন্থী ব্যক্তি বলেন যে, যাজ্জাজ প্রদত্ত সংগা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে অনুপ্রবেশ করে হাদীস হিসেবে গণ্য হয়েছে। এই প্রসংগে মুফতী শফী র. বলেন, তাদের উপরোক্ত মন্তব্য মোটেই যথার্থ নয়। কারণ আল্লামা সুয়ূতীর পূর্বোক্ত বরাত অনুযায়ী হাদীসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম হারিস ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী উসামার মুসনাদ গ্রন্থে (আলী বর্ণিত) উক্ত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হারিছ (মৃ. ২৮২ হি.) যাজ্জাজ (মৃ. ৩১১ হি.)-এর আগের যুগের লোক। তাই স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, যাজ্জাজ উক্ত হাদীসের আলোকেই নিজের সংগা রচনা করেছেন, তাঁর প্রদত্ত সংগাটি হাদীসে অনুপ্রবেশ করেনি। উপরন্তু রিবার উপরোক্ত অর্থ সাহাবীগণের যুগেও প্রসিদ্ধ ছিল। যাজ্জাজ প্রদত্ত সংগা বরং তার ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হতে পারে, উৎস নয়।

পূর্বকালের আসমানী ধর্মেও সুদ নিষিদ্ধ

রিবা আন-নাসিয়া বা মেয়াদী সুদ, এমনকি রিবা আল-ফাদলও প্রসিদ্ধ সকল আসমানী কিতাবেই হারাম ঘোষিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বাইবেলের যাত্রা পুস্তক ঃ 'তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমার স্বজাতীয় কোন দীন-দুঃখীকে টাকা ধার দাও তবে তার নিকট সুদ গ্রহীর ন্যায় হইও না, তোমরা তার উপর সুদ চাপাইবে না'।[১৯] 'তুমি তার নিকট থেকে সুদ কিংবা বৃদ্ধি নিবে না কিন্তু আপন প্রভুকে ভয় করিবে– তুমি সুদের জন্য তাকে টাকা দিবে না এবং বৃদ্ধির জন্য তাকে অন্ন দিবে না'।[২০] 'তুমি রৌপ্যের সুদ, খাদ্যসামগ্রীর সুদ বা অন্য কোন দ্রব্যের সুদ পাওয়ার জন্য আপন ভ্রাতাকে ঋণ দিবে না।[২১]

পরিমাণের উপর নিষিদ্ধতা নির্ভরশীল নয়

রিবা আন-নাসিয়ার উপরে যে সংগা প্রদান করা হয়েছে তার আলোকে ঋণের পরিবর্তে চুক্তিমত যে বর্ধিত অর্থ প্রদান করা হয় তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে, এর পরিমাণ কম-বেশি যাই হোক।

একদল লোক 'তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না' (৩ ঃ ১৩০) আয়াতের আলোকে বলতে চায়, আল্লাহ কেবল চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নিতে নিষেধ করেছেন। অতএব চক্রবৃদ্ধি হারে না হলে তা বৈধ। তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। উপরোক্ত আয়াতে মূলত সুদের মৌলিক ধরন এবং একটি বিশেষ বৈশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে, জাহিলী যুগে যার ব্যাপক প্রচলন ছিল (এবং বর্তমানে পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থায়ও প্রচলিত আছে)। অতএব 'চক্রবৃদ্ধি হার' সুদ হারাম হওয়ার জন্য শর্ত নয়, বরং অতিরিক্ত অর্থের ধারণা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয়টি ঠিক এইরূপ, যেমন আল্লাহ বলেন, 'আমার আয়াতসমূহ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করো না'।[২২] এখানে 'স্বল্প মূল্য' শর্ত হিসেবে যোগ করা হয়নি, বরং এই ধারণা প্রদানের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আয়াতের বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থই গ্রহণ করা হোক তা স্বল্পই। অতএব উক্ত আয়াতের এইরূপ অর্থ করা নিতান্তই ভুল যে, অধিক মূল্যে কুরআনের আয়াতসমূহ বিক্রি করা যাবে। এছাড়াও ইতিপূর্বে উল্লেখিত আয়াতসমূহ (২ ঃ ২৭৫-৭৬, ২৭৮-৭৯) থেকেও সাধারণভাবেই সুদ হারাম সাব্যস্ত হয়। উপরোক্ত আয়াতসমূহে সুদের সব পাওনা ত্যাগ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মূলধনের উপর বৃদ্ধিকে (তার পরিমাণ যাই হোক না কেন) জুলুম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত কাতাদা র. ২ ঃ ২৭৮-৭৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'যে ব্যক্তির অপরের নিকট ঋণ পাওনা আছে কুরআন তাকে মূলধন ফিরিয়ে নেয়ার অনুমতি প্রদান করেছে, কিন্তু এর সামান্যতম অধিক অর্থ আদায়ের অনুমতি প্রদান করা হয়নি'।[২৩] মহানবী স. এর হাদীস থেকেও উপরোক্ত আয়াতের এই তাৎপর্যই অবহিত হওয়া যায়। ইবন আবী হাতিম ও ইমাম শাফি'ঈ র. নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'সাবধান! জাহিলী যুগের প্রাপ্য সুদ তোমাদের বেলায় সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হলো। অবশ্য তোমরা তোমাদের মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না। সর্বপ্রথম আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিবের প্রাপ্য সম্পূর্ণ সুদ রহিত ঘোষণা করা হলো'।[২৪] অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ স. এর সাহাবীগণের অব্যাহত কার্যক্রম থেকেও রিবা আন-নাসিয়ার যে কোন পরিমাণ হারাম প্রমাণিত হয়। ঋণ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত যে কোন পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ প্রদানকে তাঁরা সুদ হিসেবে গণ্য করেছেন। যেমন ইবনে উমর রা. বলেন, 'নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ প্রদানে কোন দোষ নেই। ঋণগ্রহীতা তা পরিশোধকালে ঋণ বাবদ প্রাপ্ত দিরহামের তুলনায় অধিক উত্তম দিরহাম প্রদান করলেও, যদি ঋণের চুক্তিতে অপেক্ষাকৃত উত্তম দিরহাম প্রদানের শর্ত না করা হয়ে থাকে'।[২৫] উপরোক্ত হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়, চুক্তিপত্রে অপেক্ষাকৃত উত্তম দিরহাম প্রদানের (ঋণ পরিশোধ কালে) শর্ত করা হলে তা ইবনে উমর রা. এর মতে সুদ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা হারাম।

আবু বুরদা র. বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, তুমি এমন এক এলাকায় বাস করো যেখানে সুদের ব্যাপক প্রচলন আছে। যদি কারো নিকট তোমার সুদ পাওনা থাকে এবং সে ভূষি, বার্লি, পশুখাদ্য (অর্থাৎ তুচ্ছ জিনিসও) উপঢৌকন হিসেবে দিতে চায়

তবে তুমি তা গ্রহণ করো না। কারণ তা সুদ'।[২৬] আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. এর উক্ত নির্দেশ তাকওয়ার ভিত্তিতে হতে পারে অথবা সতর্কতার ভিত্তিতেও হতে পারে অথবা এই জাতীয় উপঢৌকনের এত ব্যাপক প্রচলন থাকতে পারে যে, তা চুক্তির অংশ মনে করা হয়। তাই ফিক্‌হ-এর নীতি 'আলমারূফ কালমাশরূত –এর ভিত্তিতে তিনি উক্ত উপঢৌকনকে সুদ সাব্যস্ত করেছেন।

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বললো, আমি এক ব্যক্তির নিকট থেকে এই শর্তে পাঁচ শত দিরহাম ঋণ নিয়েছি যে, তাকে আমার ঘোড়াটি বাহন হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রদান করবো। ইবনে মাসউদ রা. বলেন, সে যতবার তা বাহন হিসেবে ব্যবহার করবে ততবার তা হবে সুদ'।[২৭]

এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির নিকট বিশ দিরহাম পাওনা ছিল। দেনাদার তাকে বারবার উপঢৌকন দিতে থাকে। পাওনাদার উপঢৌকনগুলো বিক্রি করে দিতে থাকে এবং তার কাছে এর মূল্য বাবদ তের দিরহাম জমা হয়। সে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এখন তুমি মাত্র সাত দিরহাম গ্রহণ করবে।[২৮]

বায়হাকীর সুনান গ্রন্থে হযরত উমর ফারূক ও আনাস রা. সম্পর্কেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ স. ও সাহাবীগণের যুগে চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী যে কোন প্রকার উদ্বৃত্ত 'রিবা আন-নাসিয়া' হিসেবে গণ্য হতো। বরং আল্লাহর পূর্ণ অনুগত লোকদের নিকট অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত না থাকলেও উপঢৌকন বা উদ্বৃত্ত আদায় করাকে নিন্দনীয় মনে করা হতো এবং তাঁরা সুদের সন্দেহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা পরিহার করতেন এবং করাতেন।

ভোক্তা ঋণ ও ব্যবসায়িক ঋণ উভয়ের সুদ হারাম

ঋণ যে উদ্দেশ্যেই আদান-প্রদান করা হোক তা উদ্বৃত্ত-যুক্ত হলেই অতিরিক্ত অংশ সুদ হিসেবে গণ্য হবে। মহানবী স. ও সাহাবীগণের যুগে যে কোন প্রকার ঋণের উপর উদ্বৃত্তকে সুদ বলা হতো, ঋণ কোন সাধারণ আর্থিক ব্যয় নির্বাহের জন্য নেয়া হোক অথবা ব্যবসায়িক প্রয়োজনের জন্যই নেয়া হোক। বর্তমানে কিছু লোক বলে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঋণের উপর ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত আদায় করা হলে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ মহানবী স. এর যুগে কেবল উপস্থিত আর্থিক প্রয়োজন পূরণের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হতো, ব্যবসায়িক ঋণের প্রচলন ছিল না। তাদের উক্ত ধারণা যথার্থ নয়। প্রথমত, কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের অভিমতের ভিত্তিতে রিবা আন-নাসিয়ার যে সংগা প্রদান করা হয়েছে তার আলোকে ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য নির্বিশেষে উদ্বৃত্ত সুদ হিসেবে গণ্য। দ্বিতীয়ত, মহানবী স. ও সাহাবীগণের যুগে ব্যবসায়িক ঋণের প্রচলন ছিল না– এটা সম্পূর্ণ অনুমানপ্রসূত কথা। কারণ সেই যুগেও ব্যবসায়িক ঋণের প্রচলন থাকার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। যেমন ইব্‌নে জারীর তাবারীর তাফসীরে বর্ণিত আছে, আমর ইবনে উমায়ের ইবনে আওফ গোত্র মুগীরা গোত্রের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতো।[২৯] উপরোক্ত বর্ণনা এবং অনুরূপ আরও কয়েকটি বর্ণনায় আরব গোত্রগুলোর পরস্পরের নিকট থেকে ঋণ

গ্রহণের উল্লেখ আছে, তা ব্যক্তিগত পর্যায়ের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের ঋণ ছিল না, বরং সমষ্টিগত ঋণ ছিল। কারণ এই জাতীয় ক্ষেত্রে আরব গোত্রসমূহের অবস্থান যৌথমূলধনী কারবার প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনীয়। তারা সম্মিলিতভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতো, তাই তা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়, বরং ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই নেয়া হতো।

ইমাম আহমদ, আল–বাযযার ও তাবারানী র. আবদুর রহমান ইবনে আবী বাকর রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, যে ঋণ গ্রহণ করে তা পরিশোধ করেনি, এই ঋণ তুমি কেন নিয়েছিলে এবং কেন মানুষের স্বত্ব ধংস করলে? সে বলবে, হে প্রভু! আমি এই ঋণ গ্রহণ করে খাইনি, পান করিনি, পরিধান করিনি এবং অন্য কোন কাজেও খাটাইনি, বরং আমার উপর অগ্নিকাণ্ডের বিপদ আপতিত হয়েছে অথবা মাল চুরি হয়ে গিয়েছে অথবা (ব্যবসায়) লোকসান হয়েছে....।[৩০] উক্ত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে ব্যবসায়িক ঋণের ধারণা পাওয়া যায়।

যুবাইর ইবনুল-আওয়াম রা. সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি জনগণের আমানত এই শর্তে গ্রহণ করতেন যে, তা ধ্বংস বা নষ্ট হলে সে তা ফেরত পেতে পারে এবং তাঁর এই সুবিধা ছিল যে, তা ব্যবসায়ে খাটিয়ে তিনি লাভবান হতে পারেন। অতএব তিনি মরণকালে বাইশ লাখ দিরহাম রেখে যান, যা ব্যবসায়ে লগ্নিকৃত ছিল।[৩১] সাহাবীগণের যুগে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রচলিত এই ব্যাংক ব্যবস্থা ব্যবসায়িক ঋণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রসংগত এখানে উল্লেখ্য যে, আমানতদারের কোনরূপ অবহেলা বা অযত্ন ছাড়া আমানতের মাল ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে গেলে তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই। কিন্তু ঋণ যেভাবেই ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হোক তার ক্ষতিপূরণ দেয়া ঋণগ্রহীতার জন্য বাধ্যকর।

হযরত উমর ফারূক রা. এর দুই পুত্র আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ রা. ইরাক গমন করেন। ইরাকের তৎকালীন গভর্নর আবূ মূসা আল আশআরী রা. বায়তুল মাল থেকে তাদের কিছু অর্থ ঋণ প্রদান করেন, যা উমর রা. এর নিকট কেন্দ্রীয় বায়তুল মালে পৌছাতে হবে। তিনি তা তাদের নিকট আমানত হিসেবে অর্পণ না করে ঋণ হিসেবে প্রদান করেন, যাতে একদিকে পথিমধ্যে তা ধ্বংস বা নষ্ট হলে তাঁরা দু'জন এর ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য থাকেন এবং অপরদিকে তা দ্বারা তাঁরা ইচ্ছা করলে ব্যবসা করে লাভবান হতে পারেন।[৩২]

উতবার কন্যা হিন্দ রা. উমর রা. এর খিলাফতকালে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বায়তুল মাল থেকে ঋণ গ্রহণ করেন এবং কাল্ব গোত্রের বসতি এলাকায় পৌছে তা দ্বারা ব্যবসা করেন।[৩৩]

উপরোক্ত বিবরণ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. ও সাহাবীগণের আমলেও ব্যবসায়িক ঋণের প্রচলন ছিল। অবশ্য সুদ হারাম ঘোষিত হওয়ার পর সুদের আদান-প্রদান বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইসলামী আইনে 'মুদারাবা' (একজনের পুঁজি ও অপরজনের শ্রমে পরিচালিত) ব্যবসার বৈধতা থেকেও উক্ত যুগে ব্যবসায়িক ঋণের প্রচলন ছিল বলে প্রমাণিত হয় (অবশ্য তৎকালে

মুদারাবা 'কিরাদ' নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং বর্তমানেও কোন কোন মাযহাবের ফিক্‌হ্‌বিদগণ এর জন্য 'কিরাদ' পরিভাষাই ব্যবহার করেন। ডঃ জাওয়াদ আলী তাঁর ইতিহাস বিষয়ক 'আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল-আরাব কাবলাল ইসলাম'[৩৪] বিশ্বকোষে আরবদের ব্যবসায়িক জীবন ও তাদের আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাতেও প্রমাণিত হয় যে, আরবরা ব্যবসায়িক ঋণের আদান-প্রদান করতো।

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, সাহাবীগণের যুগে রিবা (সুদ) শব্দের অর্থ অস্পষ্ট ও অপরিচিত ছিল। কেননা হযরত উমর রা. বলেছেন, কুরআন মজীদের সবশেষে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের মধ্যে রিবা সম্পর্কিত আয়াতও অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ স. এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বেই ইনতিকাল করেন। অতএব তোমরা রিবা ও ত্যাগ করো এবং যেসব লেনদেনে রিবার আশংকা আছে তাও।[৩৫] তাঁর উপরোক্ত মন্তব্য 'রিবা আল-ফাদল' সম্পর্কে 'রিবা আন-নাসিয়া' সম্পর্কে নয়। কারণ রিবা আল-ফাদলের ব্যাখ্যায় যেমন সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ ছিল, তেমনি পরবর্তী কালে ফকীহ্‌গণের মধ্যেও প্রচুর মতভেদ হয়েছে (এর অবৈধতা সম্পর্কে নয়, বরং এর পরিধি সম্পর্কে)। কিন্তু রিবা আন-নাসিয়ার ব্যাখ্যায় না সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ ছিল, আর না গত চৌদ্দ'শ বছরে ফকীহ্‌গণের কোন মতভেদ বর্ণিত আছে। স্বয়ং উমর রা. বলেন, তোমরা হয়ত মনে করেছো আমরা সুদের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে অবগত নই। নিসন্দেহে সুদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 'আলেম হওয়া আমার নিকট মিসর ও তৎসন্নিহিত এলাকার শাসক হওয়ার তুলনায় অধিক প্রিয়। কিন্তু এর এমন কতগুলো শ্রেণী আছে যে সম্পর্কে কেউই অনবহিত নয়। এর মধ্যে পশুর বায়-সালাম (নগদ মূল্যে পরিশোধের ভিত্তিতে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়) ও কাঁচা ফল বিক্রিও অন্তর্ভুক্ত।[৩৬]

বর্তমান শতকের ফিকহ্‌বিদগণও রিবা আন-নাসিয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। ব্যাংক বিষয়ক মুসলিম বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁদের সহায়তায় ও পরামর্শে বিশ্বব্যাপী সুদবিহীন, এক কথায় ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছেন। ইতিমধ্যে তারা বিভিন্ন মুসলিম দেশে এমনকি খৃস্টান পাশ্চাত্যেও সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান শরীয়া আইনের আওতায় পরিচালিত হওয়ার জন্য প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি করে শরীয়া বোর্ড রয়েছে। এই বোর্ড সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে যে, ব্যাংকের কোন লেনদেনই যেন সুদযুক্ত না হতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা যায়, এখানে যে কয়টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলো, এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংক সেগুলোর নিজ নিজ জমার বিপরীতে যে সুদ প্রদান করে থাকে তা স্বতন্ত্রভাবে হিসাব করে রাখা হয়, যা অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হয় না; বরং হারাম পন্থায় আগত অর্থ শরীয়ত যে পন্থায় ও যে খাতে ব্যয়ের পরামর্শ দেয় তা সেভাবে ব্যয় করা হয়। অতএব নিসন্দেহে বলা যায়, রিবা আন-নাসিয়া হারাম হওয়ার বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর বিশেষজ্ঞগণ একমত।

২. রিবা আল-ফাদল

সুদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হলো 'রিবা আল-ফাদল'। যেহেতু তা রসূলুল্লাহ স. এর সুন্নাহর ভিত্তিতে হারাম সাব্যস্ত হয়েছে তাই এর অপর নাম 'রিবা আস-সুন্নাহ'। মূলত একই প্রজাতিভুক্ত বিশেষ কতিপয় দ্রব্যের আন্ত-বিনিময়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত 'উদ্বৃত্ত'-কে রিবা আল-ফাদল বলে। কিন্তু সেই বিশেষ কতিপয় দ্রব্য কি কি তার পূর্ণাঙ্গ আইনগত সংগা নির্ণয়ে ফিক্‌হ্‌বিদগণের মতভেদ আছে। একই প্রজাতির দ্রব্য ও মুদ্রার লেনদেন কালে একপক্ষ চুক্তি মোতাবেক অপর পক্ষকে শরীয়ত সম্মত বিনিময় ছাড়া যে বর্ধিত মাল প্রদান করে তাকে রিবা আল-ফাদল (মালের সুদ) বলে'।[৩৭] মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'একই শ্রেণীভুক্ত খাদ্যশস্যের পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়কালে এক পক্ষ অপর পক্ষকে এর সাথে যে 'বর্ধিত অংশ' প্রদান করে তাকে রিবা আল-ফাদল বলে' (পৃ. ২১৮)। ফিকহ্‌বিদগণের মধ্যে রিবা আল-ফাদল হারাম হওয়া সম্পর্কে মতভেদ নেই, বরং একই প্রজাতিভুক্ত কোন কোন দ্রব্যের আন্ত-বিনিময় বা লেনদেন রিবা আল-ফাদলের আওতাভুক্ত হবে সেই ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে। মহানবী স. এর নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে এই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে ঃ 'সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, বার্লির বিনিময়ে বার্লি, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ লেনদেন করা হলে সেই ক্ষেত্রে পরিমাণের সমতা রক্ষা করে নগদ লেনদেন হতে হবে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত প্রদান বা গ্রহণ করবে সে সুদ অনুষ্ঠানকারী সাব্যস্ত হবে এবং দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে হবে সমান পাপী।[৩৮]

উপরোক্ত হাদীসে মাত্র ছয়টি দ্রব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, একই প্রজাতিভুক্ত জিনিসের পারস্পরিক লেনদেন নগদ এবং সমান হতে হবে,হ্রাস-বৃদ্ধি করলে বা বাকিতে লেনদেন করলে তা সুদ হবে। ফিক্‌হ-এর পরিভাষায় উক্ত ছয়টি দ্রব্যকে 'আমওয়াল রাবূবিয়্যা' বলা হয়। হাদীসে এই কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, উক্ত বিধিনিষেধ কি এই ছয়টি দ্রব্যের লেনদেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না অন্যান্য দ্রব্যও এর আওতাভুক্ত হবে। তাউস ও কাতাদা র. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁরা রিবা আল-ফাদলকে উক্ত ছয়টি দ্রব্যের লেনদেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করেন। অপরাপর ফিক্‌হবিদগণের মতে আরও কতিপয় দ্রব্যও এর অন্তর্ভুক্ত হবে, কিন্তু তা কোন কোন প্রজাতির দ্রব্য সেই বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁরা দেখতে চেয়েছেন, ঐ ছয়টি দ্রব্যের মধ্যে কোন জিনিস বা বৈশিষ্টটি অভিন্ন (মুশতারাক), যাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

১. ইমাম আবু হানীফা র. বলেন, সেই অভিন্ন বৈশিষ্ট হলো ওজন (ওয়ায্‌ন) ও মাপ (কায়ল)। অর্থাৎ ঐসব জিনিস পাত্র দ্বারা মেপে বা দাড়িপাল্লায় ওজন করে পরিমাণ নির্ধারণ পূর্বক বিনিময় করা হয়। অতএব ওজন করে বা মেপে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এমন বৈশিষ্ট সম্পন্ন যে কোন দ্রব্য হাদীসের উক্ত বিধিনিষেধের আওতাভুক্ত হবে।

২. ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে 'খাদ্য ও মূল্য' অভিন্ন বৈশিষ্ট হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ কোন দ্রব্য মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হলে এবং তার আর্থিক মূল্য থাকলে তা রিবা আল-ফাদলের আওতাভুক্ত হবে।

৩. ইমাম মালিক র. এর মতে 'খাদ্যোপযোগিতা ও গোলাজাতকরণ যোগ্যতা' অভিন্ন বৈশিষ্ট হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ যে সকল বস্তু মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহারযোগ্য এবং যা গোলাজাত করে রাখা যায় তা রিবা আল-ফাদলের আওতাভুক্ত হবে।

৪. ইমাম আহমাদ র. থেকে এ সম্পর্কে তিনটি মত বর্ণিত আছে। এর একটি ইমাম আবু হানীফা র. এর এবং একটি ইমাম শাফিঈ র. এর মতের সমর্থক। তাঁর তৃতীয় অভিমত এই যে, সোনা ও রূপা ছাড়া কেবল সেইসব দ্রব্য রিবা আল-ফাদলের বিধানাধীন হবে যার মধ্যে একই সাথে মানুষের 'খাদ্যোপযোগিতা এবং ওজন অথবা পরিমাপের বৈশিষ্ট বিদ্যমান'। অর্থাৎ যে বস্তু মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং যা পাত্র দ্বারা মেপে অথবা দাড়িপাল্লায় ওজন করে বিনিময় করা হয়, সেইসব বস্তু রিবা আল-ফাদলের আওতাভুক্ত হবে। চার ইমামের উপরোক্ত অভিমত থেকে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, রিবা আল-ফাদলের বিধান হাদীসে উক্ত ছয়টি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর পরিধি আরও বিস্তৃত।[৩৯]

মুফতী শফী র. বলেন, রিবা আল-ফাদলের বিধান মূলত প্রতিরোধক প্রকৃতির। আরব জাতির মধ্যে, এমনকি পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যেও একই প্রজাতিভুক্ত দ্রব্যের পারস্পরিক লেনদেনে কম-বেশি করার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এতে রিবা আন-নাসিয়ার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার আশংকা ছিল। তাই রসূলুল্লাহ স. তার প্রতিরোধের জন্য রিবা আল-ফাদলের বিধান কার্যকর করেন। এই প্রসঙ্গে কোন কোন হাদীসের ভাষ্য নিম্নরূপ, 'ইন্নী আখাফু আলাইকুমুর-রিবা' (আমি তোমাদের ব্যাপারে সুদের আশংকা করি)।[৪০]

এতে প্রতিভাত হয় যে, রিবা আন-নাসিয়ার মূলোচ্ছেদ করার জন্যই রিবা আল-ফাদলের সহযোগী বিধান প্রযোজ্য হয়েছে।[৪১] কিন্তু কিছু সংখ্যক সাহাবী রিবা আল-ফাদলের বিধান সম্পর্কে অনবহিত থাকায় তাকে হারাম মনে করতেন না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাদের অন্যতম। তিনি উসামা ইবনে যায়েদ রা. এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন, 'লা রিবা ইল্লা ফিন-নাসিয়া'।[৪২] কিন্তু আল-মুসতাদরাক গ্রন্থের বরাতে জানা যায়, আবু সাঈদ আল-খুদরী রা. তাঁকে রিবা আল-ফাদল সম্পর্কিত হাদীস শুনালে তিনি তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজের পূর্বোক্ত মত প্রত্যাহার করেন।[৪৩] উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে অধিকাংশ ফিক্হবিদের মত এই যে, তা মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত অর্থাৎ স্বর্ণকে স্বর্ণের সাথে অথবা রূপাকে রূপার সাথে নগদ লেনদেন হলে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, এই লেনদেন বাকিতে হলে রিবা যুক্ত হয়।

কাগজি মুদ্রার আন্ত-লেনদেন

বর্তমান কালে পৃথিবীর সর্বত্র স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে কাগজি মুদ্রা প্রচলিত আছে। বাংলাদেশের কাগজি মুদ্রার নাম টাকা। অতএব টাকার সাথে টাকার পারস্পরিক লেনদেনে কমবেশি করা হলে তা সুদের মধ্যে গণ্য হবে। আর বৈদেশিক মুদ্রার সাথে দেশী মুদ্রার নগদ লেনদেন সরকারিভাবে বা আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত হারে করা হলে তাতে সুদের যোগ ঘটবে না।[৪৪]

যে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণ সুদ নয়

ঋণ গ্রহীতা চুক্তি বহির্ভূতভাবে ঋণ পরিশোধকালে এর সাথে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ প্রদান করলে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে না এবং ঋণদাতার জন্য তা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ বৈধ। আর্থিক লেনদেন বা পণ্যের লেনদেন উভয় ক্ষেত্রেই তা বৈধ। আবু হুরায়রা রা. বলেন, 'রসূলুল্লাহ স. একটি উট ধার করেন। তিনি ধার পরিশোধকালে এর তুলনায় উত্তম ও হৃষ্টপুষ্ট উট প্রদান করেন এবং বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে ধার পরিশোধে উত্তম'। আবূ রাফে রা. এর বর্ণনায় গরু ধার নেয়ার কথা উল্লেখ আছে এবং তাতেও বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে ধার পরিশোধে উত্তম।[৪৫] অতএব কোন ব্যক্তি নগদ অর্থ বা অন্য কোন বস্তু কর্জ নিয়ে তা পরিশোধকালে স্বেচ্ছায় কিছু অতিরিক্ত প্রদান করলে তা বৈধ হবে।

সুদ ও মুনাফার পার্থক্য

বর্তমান কালে সুদকে মুনাফা হিসাবে গণ্য করার একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যেমন জাহিলী যুগের লোকেরা মনে করতো। (ক) ইসলামী অর্থনীতির সংগা অনুযায়ী সুদ ও মুনাফা সম্পূর্ণ বিপরীত দু'টি জিনিস, এমনকি ধর্মহীন পুঁজিবাদী অর্থনীতিতেও সুদ ও মুনাফা ভিন্নতর দু'টি পরিভাষা। (খ) সুদ হারাম এবং মুনাফা হালাল। (গ) সুদ ঋণ ও তার মেয়াদের সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু মুনাফা ব্যবসা অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় থেকে উদ্ভূত। (ঘ) সুদ লোকসানের ঝুঁকিমুক্ত, কিন্তু মুনাফার ক্ষেত্রে লোকসানের ঝুঁকি বিদ্যমান। (ঙ) সুদের পরিমাণ পূর্ব নির্ধারিত, কিন্তু মুনাফার পরিমাণ অনির্ধারিত বা অজ্ঞাত। (চ) তাই সুদ একটি নিশ্চিত আয়, কিন্তু মুনাফা অনিশ্চিত আয়। (ছ) সুদের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ পণ্যে রূপান্তরিত হয় না, কিন্তু মুনাফা অর্জন করতে হলে নগদ অর্থে পণ্য ক্রয়ের পর একে বিক্রয়ের মাধ্যমে পুনরায় নগদ অর্থে রূপান্তরিত না করা পর্যন্ত মুনাফা অর্জিত হয় না।

ঋণ ও সুদ ঃ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞ ও চরম উদাসীন একদল মুসলমান মনে করেন, কোন ব্যক্তিকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান একটি নৈতিক সুবিধাদান ছাড়া কিছু নয় এবং ধর্ম সুদকে হারাম করে মানুষের প্রতি অযথা বাড়াবাড়ি করেছে। অন্যথায় সুদ ন্যায়ত সম্পূর্ণ বৈধ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে তা কেবল আপত্তিহীনই নয়, বরং কার্যত উপকারী ও অপরিহার্য। অর্থনীতির সমস্ত কাজ-কারবার পুঁজির প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। মানুষের সঞ্চিত সম্পদসমূহের ভিত্তিতে ব্যবসায়ে লগ্নি করার পথ উন্মুক্ত রাখাই হচ্ছে অর্থনৈতিক কাজ-কারবারের দিকে পুঁজি প্রবাহিত হওয়ার সহজতর উপায়। এভাবে সুদ পুঁজিকে অলস পড়ে থাকা অবস্থা থেকে এবং অপব্যবহার থেকে রক্ষা করে। ঋণ ব্যক্তি ও জাতির জীবনে অপরিহার্য প্রয়োজনের অংগীভূত। ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী কাজকর্ম ইত্যাদি ঋণ ছাড়া চলতে পারে না।

সুদ ও ঋণ ঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

উপরের কথাগুলো যুক্তিসংগত ও প্রয়োজনীয় মনে হলেও ইসলামে সুদ হারাম করার পশাপাশি পুঁজি সংগ্রহ ও এর ব্যবহারের পথও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। বস্তুবাদী অর্থনীতিতে ত্যাগ স্বীকারের জন্য সওয়াবের কোন প্রতিশ্রুতি নেই। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে সওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তাই ঋণের ব্যাপারে ইসলামের প্রথম বিধান এই যে, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করলে তা হবে সম্পূর্ণ স্বার্থমুক্ত, এর সাথে কোন লাভ যুক্ত হতে পারবে না। তার এই নিঃস্বার্থপরতার জন্য তাকে কুরআন ও হাদীসে সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।[৪৬]

কোন ব্যক্তি যদি তার প্রদত্ত ঋণ ফেরত না পাওয়ার সমূহ আশংকা করে তবে সেই ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখার বিধান দিয়েছে অথবা সে অবস্থায় ধনের মালিক ঋণ প্রদান থেকে বিরত থাকতে পারে।

কোন ব্যক্তি যদি তার প্রদত্ত ঋণের দ্বারা আর্থিকভাবে লাভবান হতে চায় তবে তাকে ইসলামী আইন অনুযায়ী বিনিয়োগ চুক্তিতে আসতে হবে। এই চুক্তি মোতাবেক তা যেমন তার পুঁজির জন্য লাভবান হতে পারবে, তদ্রূপ তাকে লোকসানের দায়ও বহন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। কারণ লোকসানের ক্ষেত্রে শুধু পুঁজির যোগানদাতাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, বরং পুঁজি ব্যবহারকারীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লোকসান হলে সে একদিকে মুনাফা থেকে বঞ্চিত হয় এবং অন্যদিকে সে যে দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম বিনিয়োগ করেছিল তার বিনিময় প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত থাকে। অতএব পুঁজির যেমন মূল্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব আছে, তদ্রূপ মানবীয় শ্রম ও মেধারও একটি মূল্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব আছে। পুঁজি নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যেমন ঝুঁকি আছে, তদ্রূপ মেধা ও শ্রম নিষ্ফল হওয়ার ঝুঁকিও বিদ্যমান। ইসলামী শরীয়ত এই দু'টি বিষয় পাশাপাশি বিবেচনায় রেখে লভ্যাংশ ভোগ ও লোকসান বহনের ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগের বিধান প্রদান করেছে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'আল-খারাজ বিদ-দামান' (আয় প্রাপ্তি লোকসানের ঝুঁকির সাথে সংযুক্ত)।

বস্তুবাদী অর্থনীতিতে বলা হয়েছে, 'মুনাফা অর্জন অর্থের নিজস্ব গুণ' (Money begets money)। কাজেই কোন ব্যক্তি যখন অন্যের অর্থ ব্যবহার করে তখন ঐ অর্থই এমন অধিকার সৃষ্টি করে যার ভিত্তিতে অর্থের মালিক সুদ দাবি করতে পারে এবং অর্থের ব্যবহারকারী তা প্রদান করতে বাধ্য। কিন্তু উক্ত দাবি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। মুনাফা অর্জন অর্থের একান্তই নিজস্ব গুণ নয়, বরং তা মুনাফা অর্জনের উপাদানসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি উপাদান, একমাত্র উপাদান নয়। পুঁজি ব্যবহারকারীর পরিশ্রম, দৈহিক ও বুদ্ধিগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, পুঁজি ব্যবহারকালে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আনুকূল্য ও বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভ ইত্যাদি উপাদানসমূহ অর্থের সাথে যুক্ত হলেই তা মুনাফা অর্জন করতে পারে এবং এসব উপাদানের অসহযোগিতায় মুনাফার পরিবর্তে লোকসান হতে পারে। কাজেই 'মুনাফা অর্থের নিজস্ব গুণ' দাবি করা অর্থহীন।

সুদের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া

যারা সুদের পক্ষে ওকালতি করেন তারা এর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে মূক। পুঁজিপতি যে হারে সুদ আশা করে সেই হারে সুদ পাওয়ার আশা না থাকলে সে নিজ অর্থ ঋণ দিতে রাজী হয় না। ফলে জাতীয় পুঁজির এক বিরাট অংশ নিষ্ক্রিয় পড়ে থাকে। এতে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হয়, পণ্যের প্রয়োজনীয় সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয় এবং উৎপাদনের উপকরণাদি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। সুদের হার অধিক হলে পুঁজিপতি ব্যবসায়ের যথার্থ প্রয়োজন ও স্বাভাবিক চাহিদা অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ না করে নিজের স্বার্থমত এর প্রবাহ কখনও বাড়ায়, কখনও কমায় এবং কখনও বন্ধ করে দেয়। এর ফলে বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। সুদ ও এর হারের উঠানামার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প উৎপাদন স্বাভাবিক নিয়মে ও স্বচ্ছন্দ গতিতে চলার পরিবর্তে এমন এক ব্যবসায়িক চক্করে পতিত হয় যার ফলে তা বারবার মন্দার শিকার হয়। যেসব কাজ ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতির জন্য লাভজনক কিন্তু মুনাফার দিক থেকে কম লাভজনক বা লাভজনক নয়, সেই ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করতে কেউ অগ্রসর হতে রাজি হয় না। পক্ষান্তরে যেসব কাজ অপ্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও অধিক লাভজনক পুঁজি সেইসব ক্ষেত্রে প্রবাহিত করা হয়– ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও উপযোগিতা বিবেচনা না করে। এর দ্বারাও জাতির ক্ষতি বর্ধিত হয়। বৃহৎ ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে যেমন প্রচুর সময়ের প্রয়োজন তদ্রূপ প্রচুর পুঁজিরও প্রয়োজন, এইসব ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য সুদ প্রদানের চুক্তিতে ঋণ সরবরাহ করা হয়। এই দীর্ঘ মেয়াদে কোন কারণে ব্যবসায় লাভজনক নাও হতে পারে কিন্তু তৎসত্ত্বেও পুঁজির মালিকের সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে উদ্যোক্তাগণ উদ্যমহীন ও নিঃস্ব হয়ে পড়েন। ফলে এই সুদ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

কখনো কখনো রাষ্ট্র দেশবাসীর নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এই ঋণ এমন প্রয়োজনীয় খাতেও ব্যয় হয়ে থাকে যা সম্পূর্ণ অনুৎপাদনশীল; বলা যায়, কোন ব্যক্তির পরিবারের খোরাক ক্রয় করার মতো অনুৎপাদনশীল। এই ক্ষেত্রে সুদের হার তুলনামূলকভাবে কম হলে বা সুদ প্রদানের ব্যবস্থা না থাকলে পুঁজিপতিগণ তাদের পুঁজি লগ্নি করতে অগ্রসর হবে না। ফলে জাতির প্রয়োজনীয় কাজ ব্যাহত হয়। সমাজ ও রাষ্ট্র যে ব্যক্তির জন্ম দিয়েছে, যাকে লালন-পালন করেছে, অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেছে, অর্থনৈতিক কার্য পরিচালনার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এবং আরো বহুভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে– সেই ব্যক্তিই আজ সুদখোর মহাজনে পরিণত হয়ে রাষ্ট্রকে পুঁজি সরবরাহ করতে প্রস্তুত নয়।

সুদের আন্তর্জাতিক কুফল আরো মারাত্মক আরো ভয়াবহ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের জন্য। ব্যক্তিগত ঋণ, ব্যবসায়িক ঋণ ও রাষ্ট্র কর্তৃক অভ্যন্তরীণভাবে গৃহীত সুদী ঋণের মধ্যে যেসব ক্ষতিকর উপাদান বিদ্যমান এর সবই বৈদেশিক ঋণের মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু এই শেষোক্ত ঋণের মধ্যে ঐগুলোর তুলনায় আরো অধিক ক্ষতিকর একটি উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। ঋণদাতা

দেশসমূহ তাদের পরামর্শ মোতাবেক ঋণগ্রহীতা দেশকে তা ব্যয় করতে বাধ্য করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণদাতা দেশ বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ঋণগ্রহীতা দেশে তাদের ঋণের সাথে নিজস্ব বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে তাদের বেতন-ভাতা বাবদ ঋণের সিংহভাগ গ্রাস করে। আন্তর্জাতিক ঋণের কারণে জাতির আর্থিক মর্যাদা বিনষ্ট হয়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেকটা ব্যাহত হয়, বিপদগ্রস্ত জাতির যুব সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে চরমপন্থী অর্থনৈতিক দর্শন গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হয় এবং জাতিকে অনভিপ্রেত বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়। নিজের সংকট নিরসন ও প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যে দেশের অর্থনৈতিক উপকরণ যথেষ্ট ছিল না, সেই দেশ কেমন করে প্রতি বছর আসলের কিস্তিসহ কোটি কোটি টাকার সুদ পরিশোধ করতে সক্ষম হতে পারে? তাই এই ঋণ দেশের সংকট বৃদ্ধিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। ঋণের কিস্তি ও সুদের অর্থ সংস্থানের জন্য সরকার জনগণের উপর অত্যধিক করভার চাপাতে বাধ্য হয় এবং এর ফলে জনগণের মধ্যে অস্থিরতা বেড়ে যায়, এতে দেশ ও জাতির অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং এক পর্যায়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এরই সুযোগে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ উন্নয়নশীল দেশসমূহকে তার ক্রীড়ণকে পরিণত করে। এইভাবে তা একটি দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তবুও এটা সত্য যে, অনুন্নত দেশের অগ্রগতির জন্য বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন রয়েছে। ঋণদাতা উন্নত দেশসমূহ এই ব্যাপারে আরো উদার হতে পারে এবং সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে পারে এই লক্ষে যে, ঋণ দেয়া হবে মানবতার খাতিরে, কোন স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নয়।

সুদের নৈতিক ক্ষতি

সুদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষতির সাথে সাথে এর নৈতিক ক্ষতিও বিদ্যমান। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিই মানবতার মূল প্রাণশক্তি। মানবতার এই প্রাণশক্তির জন্য ক্ষতিকর যে কোন বস্তু অন্যদিক দিয়ে যতই উপকারী হোক না কেন তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। সুদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অর্থ সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে সুদী ব্যবসায়ের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যন্ত সমগ্র মানসিক কর্মকাণ্ড স্বার্থান্ধতা, কার্পণ্য, সংকীর্ণমনতা, মানবিক কাঠিন্য ও অর্থ পূজার প্রভাবাধীনে পরিচালিত হয়। মানব চরিত্রের মহৎ গুণাবলী তথা দানশীলতা, মহানুভবতা, উদারতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও স্বার্থত্যাগের গুণকে সুদ প্রাপ্তির লোভ ধ্বংস করে দেয়। সুদখোর কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার পরিবর্তে তার বিপদ ও অসহায়ত্বের সুযোগে অধিক সুদ অথবা অতি মুনাফা অর্জনের চেষ্টায় মত্ত থাকে।

এসব কারণে দীন ইসলামে সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন মজীদে সুদখোরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[৪৭] রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ সুদ এমন একটি ধ্বংসাত্মক পাপ যে, এই পাপকে সত্তরটি ভাগে বিভক্ত করলে এর সর্বাধিক হালকা অংশটি হবে নিজের মাকে বিবাহ করার সমতুল্য।[৪৮]

তথ্যপঞ্জি

১. সূরা হজ্জ- ৫।
২. সূরা বাকারা- ২৭৬।
৩. সূরা রা'দ- ১৭।
৪. সূরা হাক্কা- ১০।
৫. সূরা নাহল- ৯২।
৬. সূরা রূম- ৩৯।
৭. ৩ খ., ১১৭।
৮. আল-জাযীরী, ২ খ., ২৪৫।
৯. লুগাতুল-ফুকাহা, পৃ. ১১৮।
১০. কাওয়াইদুল ফিক্‌হ, পৃ. ৩০১।
১১. সূরা বাকারা-২৭৫-৭৬।
১২. সূরা বাকারা- ২৭৮-৭৯।
১৩. সূরা আলে ইমরান- ১৩০।
১৪. সহীহ্ মুসলিমের বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ, বাংলা অনু., ৬ খ., পৃ. ২৬, নং ২৬৮৭/১; আরও দ্র. নং ২৭০৫/২৩, পৃ. ৩৮।
১৫. ইবনে মাজা ও বায়হাকীর শু'আবুল' ঈমান-এর বরাতে মিশকাত, বাংলা অনুবাদ ৬ খ., পৃষ্ঠা ৩৭, নং ২৭০২/২০।
১৬. আহকামুল কুরআন, ১খ., ৫৫৭।
১৭. আল-জামিউস-সাগীর, ১খ., ৯৪।
১৮. বায়হাকী আস-সুনান, ৫খ., ৩৫।
১৯. ২২ ঃ ২৫।
২০. লেবীয় পুস্তক, ২৫ঃ৩৬ -৭।
২১. দ্বিতীয় বিবরণ, ২৩ ঃ ১৯।
২২. ২ ঃ ৪১।
২৩. তাফসীর ইবনে জারীর, ৩খ., ৬৭।
২৪. ইব্‌ন কাছীর, ১ খ., ৩৩১।
২৫. বুখারী, দিল্লী সংস্করণ ১৩৫৭ হি., ১খ., ৩২৩।
২৬. বুখারী, দিল্লী সংস্করণ, ১৩৫৭ হি., ১খ., ১৫৩৮, মানাকিব আবদিল্লাহ ইবনে সালাম।
২৭. বায়হাকীর সুনানুল কুবরা, ৫খ., ৩৫১।
২৮. পৃ. গ্র., ৫খ., ৩৫০।
২৯. আদ-দুররুল-মানছুর, ১খ., ৩৬৬।
৩০. মাজমাউয-যাওয়াইদ, ৪ খ., ১৩৩।
৩১. বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব বারাকাতিল-গাযী ফিল-জিহাদ, ১ম খ., ৪৪১।
৩২. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল-কিরাদ, পৃষ্ঠা ২৮৫।
৩৩. তাবারী, ৩ খ., ৮৭।
৩৪. ইসলাম-পূর্ব আরবের বিস্তারিত ইতিহাস-এর সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৭-৪৪৪।
৩৫. কানযুল-উম্মাল, ২খ., ২৩১, নং ৪৯৫৪।
৩৬. কানযুল-উম্মাল, ২খ., ২৩২, ২৩৩, নং ৪৯৬৯; আবদুর রায্‌যাক ও আবূ উবায়দ-এর গ্রন্থদ্বয়ের বরাতে।
৩৭. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১খ., ৪৪১।
৩৮. সহীহ্ মুসলিমের বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ, বাংলা অনুবাদ, ৬ খ., ২৭, নং ২৬৮৫/৩; আরও দ্র. নং ২৬৮৪/২, ২৬৮৮/৬, ২৬৯৫/১৩; কানযুল উম্মাল, ২খ., ২১৫, নং ৪৬৬৯, তিরমিযীর বরাতে।
৩৯. আল-মুগনী, ৪খ., পৃ. ৪।
৪০. কানযুল উম্মাল, ২খ., পৃষ্ঠা ২৩১।
৪১. ই'লামুল-মুওক্কাঈন, ২খ., ১০০।
৪২. ধারের মধ্যেই সুদ হয়, বুখারী, ১ম খ., ২৯১।
৪৩. ফাতহুল বারী, ৪ খ., ৩০৩।
৪৪. 'জাহানে নও' পত্রিকায় প্রকাশিত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমের অভিমত।
৪৫. মুসলিম, ২ খ., পৃষ্ঠা ৩০।
৪৬. দ্র. সূরা হাদীদ- ১১, সূরা মুয্‌যাম্মিল- ২৩, সূরা বাকারা- ২৮০।
৪৭. দ্র. ২ ঃ ২৭৯।
৪৮. ইবনে মাজা ও বায়হাকীর বরাতে মিশকাত, বাংলা অনুবাদ, ৬ খ., পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭, নং ২৭০২/২০।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, পৃষ্ঠা : ৬২-৭২

ইসলামী শরীয়তের লক্ষ ও কল্যাণসমূহ

ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম

দুই

ইতিপূর্বে যে আলোচনাগুলো করা হয়েছে সেগুলোকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিচে কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো।

এক. কালেমার ভাষ্য ও সালাত ইত্যাকার ইবাদতগুলো আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ এবং তাঁর মহত্ব ও গৌরব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে। আনুগত্য ও বশ্যতার ক্ষেত্রে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে মনের মিল থাকার প্রতি এ ধরনের ইবাদত ইঙ্গিত বহন করে। এটাই শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য। মানুষ যখন জাগতিক স্বার্থে কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ প্রতিরোধের অভিপ্রায়ে উপরোক্ত কাজ করে; যেমন অন্য কিছুর জন্য নয় বরং কেবলমাত্র প্রাণ ও ধনসম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে কালেমার ঘোষণা দেয়া কিংবা মানুষের প্রশংসা পাওয়া অথবা দুনিয়াতে মর্যাদা লাভের অভিপ্রায়ে নামায পড়া– এ ধরনের কাজ দৃশ্যত বিধিবদ্ধ মনে হলেও মূলত এগুলো শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ যে কল্যাণের উদ্দেশ্যে এ ধরনের কাজের প্রবর্তন করা হয়েছে কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্য বিকৃত হওয়ায় কাজগুলো বিধিবদ্ধ ও প্রত্যাশিত লক্ষের বিপরীত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

দুই. যাকাত বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য হলোঃ ধনী ব্যক্তিদের মন-মস্তিষ্ক থেকে কৃপণতার অপছায়া হটিয়ে দেয়া, গরীব-দুঃখীদের হৃদয়-মন হিংসা-বিদ্বেষের পংকিলতা মুক্ত করা, গরীব-মিসকীনের উপকার করা এবং অবহেলাকারী ও শৈথিল্য প্রদর্শনকারীদেকে ত্যাগ-তিতিক্ষার জন্য পুনরুজ্জীবিত করা। কোন ব্যক্তির ওপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হয়েছে। সে তা থেকে নিজেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে বছরের শেষ দিকে যাকাত দান করলো। তারপর বছর অতিক্রান্ত হবার পর সে তার দানকৃত সম্পদ ফেরত চাইলো। এ ধরনের দানে যাকাতের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, বরং কার্পণ্য প্রবণতা শক্তিশালী হয়, হিংসা-বিদ্বেষ বেড়ে যায় এবং গরীব-দুঃখীদের সাথে আন্তরিকতার পরিবেশ শিথিল হয়ে যায়। এ ধরনের দান-খয়রাত শরীয়ত সম্মত না হওয়া এবং শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য বিরোধী হওয়া সহজেই অনুমেয়। কারণ দানের লক্ষ হলো দানগ্রহণকারী ব্যক্তি ধনী হোক বা গরীব

লেখক : ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম ছিলেন সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন বিভাগের চেয়ারম্যান। মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রন্থ 'আল-মাকাসিদুল আম্মাতু লিশ্ শারীয়াতিল ইসলামীয়াহ' থেকে প্রবন্ধটি গৃহীত।

তার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা। এ ধরনের অপতৎপরতা শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছা বিরোধী। তাই এগুলো বিধিবদ্ধ আইনের জন্য হুমকি স্বরূপ।

তিন. 'ফিদিয়া' বা খোলা আইনসিদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যই হলো, স্বামীর সম্মতিক্রমে স্ত্রীর মান-ইজ্জত বেচাকেনা তথা পদদলিত হওয়া থেকে রক্ষা করা। এরূপ ব্যবস্থা অবৈধ পথে অগ্রসর না হওয়ার জন্য রক্ষাকবচও। আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা রক্ষা করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখা অসম্ভব হওয়া অবস্থায় 'ফিদিয়া' বা খোলা বিকল্প প্রক্রিয়া। ফিদিয়ার এটিই শরীয়তসম্মত ও কল্যাণমূলক লক্ষ। সময় ও সম্পদ কোনো দিক দিয়েই এ বিধানে অকল্যাণ নেই। স্বামী ফিদিয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করলে তা হবে শরীয়ত বিরোধী। কারণ চাপ সৃষ্টি ছাড়াই যখন দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর অবকাশ রয়েছে তখন চাপ সৃষ্টি করা শরীয়তের বিধান বহির্ভূত। এ অবস্থায় ফিদিয়া তথা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেয়ার তাৎপর্য বহন করে না। কারণ এটা হলো চাপের মুখে আদায় করা ফিদিয়া। চাপ প্রয়োগ করা না করার দিক থেকে যদিও এটা স্ত্রীর জন্য জায়েয কিন্তু স্বামীর জন্য কোনো ক্রমেই জায়েয নয়। কারণ এরূপ করা ফিদিয়া প্রবর্তনের উদ্দেশ্য বিরোধী।[৭৫]

চার. ব্যভিচারের দণ্ড বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য হলো বংশ ও গোষ্ঠীর কল্যাণ রক্ষা করা। এ কারণেই এ অপরাধের জন্য কঠোর শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে কোনো প্রকার দয়া শৈথিল্য প্রদর্শনের অবকাশ রাখা হয়নি। ফলে এ ধরনের শাস্তি হয় রক্ষাকবচ ও দৃষ্টান্তমূলক। এ ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এক্ষেত্রে আর্থিক দণ্ডাদেশ মূলত অগ্রহণযোগ্য এবং মালিকানা পরিবর্তনেরও অবকাশ নেই। কারণ এরূপ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অনভিপ্রেত এবং শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছা বিরোধীও। নিম্নোক্ত হাদীসটি এর প্রমাণ। হাদীসটিতে বলা হয়েছে ঃ 'এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ছেলে অমুকের কর্মচারী ছিল। সে মালিকের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করলে আমি অপরাধের শাস্তি স্বরূপ লোকটিকে এক শত ছাগল ও একটি খাদেম ফিদিয়া (জরিমানা) স্বরূপ প্রদান করেছি। তিনি বললেন, এক শত ছাগল ও খাদেম তুমি ফেরত নিয়ে যাও। তোমার ছেলেকে এক শত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরী করা হবে।'[৭৭]

ব্যভিচারের শাস্তি আর্থিকভাবে প্রদান করা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য বিরোধী। তাছাড়া এ ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে বংশ সংরক্ষণের অভীষ্ঠ লক্ষ অর্জনের সুযোগ নেই।

আমরা বলতে পারি, মানুষের কাজের তিনটি উদ্দেশ্য থাকে। একটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত। এ ধরনের কাজ গৃহীত হবে এটাই স্বাভাবিক, পূণ্যময় ও বাঞ্ছনীয়। মানুষের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব এটিই দাবী করে। কাজের অন্য উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, আল্লাহর জন্য নিবেদিত না হওয়া। এ ধরনের কাজ আপাত দৃষ্টিতে কল্যাণমুখী হলেও প্রকৃতপক্ষে তা গৃহীত, পূণ্যময় ও বাঞ্ছনীয় নয়। সামনের দিকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

এখন থাকে তৃতীয় উদ্দেশ্যটি। আল্লাহ ও গায়রুল্লাহ উভয়ের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা হয়। এ উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য নয় আবার সম্পূর্ণ গায়রুল্লাহর জন্যও নয়। এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক

কাজের হুকুম কি? যতটুকু আল্লাহর জন্য ততটুকু গৃহীত এবং বাকিটুকু পরিত্যক্ত অথবা সবটুকু বাতিল, এ নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। এর জবাবে বলতে চাই, এই উদ্দেশ্য হয় তিন ধরনের ঃ

এক. কাজের সূচনায় ছিল আল্লাহর প্রতি একাত্মতা ও নিস্বার্থপরতা। পরে মাঝপথে প্রদর্শনেচ্ছা, স্বার্থপরতা ও গায়রুল্লাহ প্রীতি ইত্যাকার অসৎ উদ্দেশ্যাবলী প্রারম্ভিক উদ্দেশ্যের সাথে মিশে যায়। এ ধরনের কাজের ফলাফল মধ্যবর্তী সময়ের নিয়তের দৃঢ়তার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ গায়রুল্লাহ তথা অসৎ উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা সৎ উদ্দেশ্যকে রহিত না করা পর্যন্ত কাজটি মূল্যায়নযোগ্য।

দুই. প্রথমটির বিপরীত। অর্থাৎ কাজের সূচনাই হয়েছে গায়রুল্লাহ বা অসৎ উদ্দেশ্যে। পরে গায়রুল্লাহর সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন মিশে যায়। অতীতের এ ধরনের কাজ বিবেচনাযোগ্য নয়। বিবেচনাযোগ্য হয় বর্তমানের এ ধরনের কাজের দৃঢ়তা ও উদ্দেশ্য। ইবাদত যদি এমন পর্যায়ের হয় তাহলে তার সূচনা সঠিক না হলে সমাপ্তিও সঠিক হবে না। এ অবস্থায় এটি পুনরায় করতে হবে। যেমন সালাত। আর এ ধরনের না হলে পুনরায় করা জরুরী নয়। যেমন কারোর আরাফাতের ময়দানে অবস্থান শুরুতে গায়রুল্লাহর জন্য ছিল। পরে নিয়তের পরিবর্তন ঘটলো এবং তার এ অবস্থান আল্লাহর জন্য নিবেদিত হলো। এ অবস্থায় আরাফাতে অবস্থানের কাজটি পুনরায় করা ওয়াজিব নয়।

তিন. আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের উদ্দেশ্যে কাজ বা ইবাদতের সূচনা করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফরয আদায় করা হয় এবং মানুষের কাছ থেকে তার প্রতিদান ও ধন্যবাদ পাওয়ার প্রত্যাশা করা হয়। যেমন প্রতিদানের বিনিময়ে কারো সালাত আদায় করা। এক্ষেত্রে তার সালাত আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের উদ্দেশ্যে হবে যদিও সে বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ না করেই সালাত করে থাকে। অনুরূপভাবে ফরযের দায়িত্ব এড়ানোর উদ্দেশ্যে হজ্ব করা। সাথে উদ্দেশ্য এটাও থাকে যে, লোকে বলবে, 'অমুক হাজী সাব।' এমনিভাবে যাকাত আদায় করা। ফরযের দায়িত্ব পালন করা শর্ত থাকলেও এ ধরনের মিশ্র ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। এ পন্থায় আদায়কৃত ফরয কাজ আবার করা ওয়াজিব। কারণ কাজের বিশুদ্ধ ও ফলপ্রসূ হওয়ার শর্ত হচ্ছে যথার্থ আন্তরিকতা ও একমুখীনতা। এ শর্তটি এ ধরনের ইবাদতে অনুপস্থিত। এ ধরনের কাজের হুকুম শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। শর্তের অনুপস্থিতিতে হুকুমও অনুপস্থিত হয়।

'ইখলাস' তথা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা হলো নিখুঁত ও নির্ভেজাল উদ্দেশ্য হওয়া। আনুগত্য আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত হওয়া এবং তাঁর ছাড়া আর কারোর জন্য নির্দেশিত না হওয়া। আদিষ্ট বস্তু এ পর্যায়ে পৌছুলে এবং নির্দেশ দেবার সময়ের মধ্যে আর কিছু অবশিষ্ট না থাকলে 'ইখলাস' পূর্ণতা লাভ করে।[৭৮]

সুস্পষ্ট হাদীস এর প্রমাণ। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন ঃ 'আমি মুশরিকদের শিরক থেকে মুক্ত। যে এমন কাজ করে যার মধ্যে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমার সাথে শরীক করে আমি তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি যে, সে শিরক করতেই থাকবে।'[৭৯]

এ অর্থই প্রতিধ্বনিত হয়েছে আল্লাহর এ বাণীতে ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত লাভের অভিলাষী তার নেক কাজ করা উচিত এবং তার রবের ইবাদতের সাথে অন্য কাউকে শরীক করা উচিত নয়।'[৮০]

আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ 'দীনের উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া অন্য কিছুর জন্য তোমাদের নির্দেশ দেয়া হয়নি।'[৮১]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'এক ব্যক্তি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছে, অন্য একজন ক্রোধের বশে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং তৃতীয় জন লোক দেখাবার জন্য যুদ্ধ করছে– এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার অভিপ্রায়ে যুদ্ধে লিপ্ত সে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে।'[৮২] যুদ্ধের প্রকৃতি এক কিন্তু লক্ষ ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। যেমন সিজদার ধরন এক কিন্তু সিজদা আল্লাহর জন্য হলে হবে ঈমান আর গায়রুল্লাহর জন্য হলে হবে কুফরী।

উদ্দেশ্য দু'ভাগে বিভক্ত : মৌলিক ও সহায়ক

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ মৌলিক ও সহায়ক হিসাবে দু'ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ শরীয়ত প্রণেতার স্বাভাবিক ও বশ্যতামূলক আহকামের কিছু উদ্দেশ্য মৌলিক এবং কিছু উদ্দেশ্য তাদের সহায়ক। যেমন বিবাহের উদ্দেশ্যের কথা ধরা যায়। বংশ বৃদ্ধি তথা মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখাই হচ্ছে বিবাহের মৌল উদ্দেশ্য। বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রবণতা সৃষ্টি করা, সম্প্রীতি ও সহানুভূতির বন্ধন তৈরি করা, পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন যাপনের ইচ্ছা পোষণ করা, স্ত্রীর সম্পদের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া, স্ত্রীকে স্বামীর পরিমণ্ডলে এবং সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বেরাদরের পরিধিতে প্রতিষ্ঠিত করা, চোখ-কান-লজ্জাস্থান ইত্যাকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যৌনতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি হারাম কাজ থেকে হেফাজত করা। এসব বৈশিষ্ট্য হলো বিবাহ কর্মের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য।[৮৩]

বিবাহ প্রথা বিধিবদ্ধ করার মাধ্যমে উক্ত বিষয়গুলোর বাস্তবায়নই মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য। এগুলো নস্ (কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ) অথবা ইশারা (ইঙ্গিতবহ নির্দেশ) দ্বারা প্রমাণিত। এর মধ্যে আবার কতকগুলো রীতি-নীতি এবং নস থেকে অনুসৃত ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত। এসব আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বাড়ায়, কৌশলে শক্তি যোগায় এবং মৌল উদ্দেশ্যের অন্বেষণ ও প্রয়োগকে সহজসাধ্য করে। এ ধরনের উদ্দেশ্য শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের বিপরীত নয় এবং তাতে মূল উদ্দেশ্য বাতিল হয় না যদিও এ ধরনের উদ্দেশ্যকে মানব মস্তিষ্ক প্রসূতরূপে গণ্য করা হয়। কারণ এসব প্রাসংগিক উদ্দেশ্য শরীয়ত প্রণেতা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যের অধীন থাকে এবং তাকে নিশ্চিত করে। অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছাবিরোধী হলে তা হবে অগ্রহণযোগ্য পরিত্যক্ত। যেমন 'মুতা' বিবাহ ও 'মুহাল্লাল' বিবাহ। কারণ এ ধরনের কাজ সার্বিক আকাঙ্ক্ষার বিপরীত। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিধানসম্মত উদ্দেশ্য হলো চিরন্তন সম্প্রীতির

বন্ধন সুদৃঢ় করা। অন্তরবর্তীকালীন সময়ের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে (মুতা' বা মুহাল্লাল বিবাহ) বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য চিরন্তন এবং সার্বিক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হতে পারে না। এ কারণে অধিকাংশ আলেম 'মুতা' বিবাহ বাতিল হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীতে বংশ রক্ষার আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

এমনিভাবে অন্যান্য ইবাদত সম্পর্কেও বলা যায় যে, ইবাদতের মৌল উদ্দেশ্যই হচ্ছে একজন মাবুদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং এককভাবে তাঁরই ইবাদত করা। ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর অলী হওয়া বা আখেরাতে মর্যাদা লাভের বিষয়টি হচ্ছে এর অনুবর্তী। এ ধরনের প্রাসংগিক উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্যের সহায়ক ও শক্তি বর্ধক এবং গোপনে-প্রকাশ্যে চিরন্তন ও সর্বব্যাপী প্রত্যাশার বাস্তবায়নকারী হয়। তাছাড়া ইবাদত করার পেছনে যদি ধনসম্পদ লাভ, প্রাণের হেফাযত কিংবা মানুষের কাছে সম্মান, মর্যাদা ও পার্থিব বস্তু লাভের সুপ্ত বাসনা থাকে তাহলে এ ধরনের উদ্দেশ্য শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য বিরোধী হওয়ায় এবং মূল উদ্দেশ্যের সহায়ক ও সম্পূরক না হয়ে বিরোধী হওয়ায় তার পরিত্যাজ্য হওয়ার বিষয়টি সহজেই অনুমান করা যায়। সুপ্ত বাসনাগুলো চিরন্তন নয়, সাময়িক সর্বব্যাপী নয়, ব্যক্তিকেন্দ্রীক; উদ্দীপক নয়, হতাশাব্যঞ্জক। এ ধরনের বাসনা মানুষকে অভীষ্ট লক্ষে পৌছাতে অক্ষম। এ ধরনের বাসনা সঞ্জাত ইবাদত মানুষকে সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্বেষী করে তোলে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সাথে। তার মংগল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে এবং আখেরাতেও। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।'[৮৪]

কাজ করার সময় ব্যক্তি এ ধরনের মনোবাসনা পোষণ করলে কাজটি মূল উদ্দেশ্য বিরোধী হওয়ায় গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে মনের গহীনে এ ধরনের মনোভাবের উদয় হলে তা ক্ষতিকর নয়। যেমন মূল লক্ষকে অব্যাহত রাখার মানসে সাময়িক লক্ষকে সামনে রেখে বিবাহ করার পর বিচ্ছেদ ঘটে গেলে দৃশ্যত তা 'মুতা' কিংবা 'তাহলীল' বিবাহের সমপর্যায়ে হয়ে যায়। তেমনি আল্লাহর ইচ্ছা পূরণের মানসে সাময়িক ইচ্ছাকে সামনে রেখে ইবাদত করতে গিয়ে জান-মালের হেফাযত এবং মান-মর্যাদা অর্জিত হয়ে গেলে তা দৃশ্যত রিয়া ও খ্যাতি অর্জনের সমপর্যায়ে পৌছে যায়। প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা কাজের সূচনায় মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হলে তার পরিণতি শুভ ও কল্যাণকর হতে পারে না। অন্যদিকে মূল লক্ষ অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজের সূচনা করার পর সাময়িক উদ্দেশ্য সাধিত হলে তাতে মূল লক্ষ কল্যাণ সাধনে বিঘ্ন ঘটায় না।[৮৫] কাজেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে তা মুতায় এবং সালাতের মাধ্যমে সম্মান লাভ করলে তা রিয়ায় পরিণত হবে না। কেননা এ ধরনের উদ্দেশ্য লাভ কাজের সূচনায় ছিল না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট জানা গেলো, মহান আল্লাহ যে বিধান রচনা করেছেন তার পেছনে উদ্দেশ্য রয়েছে। দায়িত্বশীলের ইচ্ছা শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছার অনুসারী হলে কাজটি সঠিক, গ্রহণযোগ্য ও শুভ পরিণামবহ হবে। এ পর্যায়ে শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছা হবে হুকুমদাতা আর

মানুষের ইচ্ছা হবে হুকুম গ্রহীতা। হুকুম গ্রহীতার কাজ হুকুমদাতার ইচ্ছা বিরোধী হলে তা হুকুমদাতার কাছে অগ্রহণযোগ্য হবে এটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে মূল লক্ষের সহায়ক ও সম্পূরক ইচ্ছা পোষণ করে কাজ শুরু করলে তাতে কাজটি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ কাজটির সূচনা হয়েছে সহায়ক ও সাময়িক উদ্দেশ্যে, মূল উদ্দেশ্য লক্ষ করে নয়।

এ আলোচনার ইতি টানার আগে বিজ্ঞ উসূলবিদগণের দৃষ্টিতে একটি প্রখ্যাত বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। কেননা এ আলোচনার সাথে বিতর্কিত বিষয়টির যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে ঃ নিষিদ্ধ বস্তুর নিষিদ্ধ হওয়ার কার্যকরিতা, নিষিদ্ধ বিষয়টি কোনো কাজ অথবা কথা হতে পারে।[৮৬]

নিষিদ্ধ কাজের উদাহরণ হলো, আল্লাহর বাণী ঃ 'তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না।'[৮৭] অথবা আল্লাহর এ বাণী ঃ 'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।'[৮৮]

কথার অর্থ হলো, শরীয়ত প্রণেতা দু'পক্ষের মধ্যে কথার মাধ্যমে যে বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যেমন, 'বাঈ', 'কিফালত', 'ওয়াকফ' ইত্যাকার শব্দগুলো। 'বাঈ' শব্দটি দেয়া-নেয়া তথা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বন্ধন স্থাপন করা বুঝায়। তেমনি 'নযর' (মানত মানা) এবং 'ওয়াকফ' প্রভু ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ বুঝায়।

কর্মমূলক নিষেধাজ্ঞা হলে নিষিদ্ধ কাজটি হবে সহজাত। তখন কর্মটি যার হুকুমের জন্য নিয়ামত স্বরূপ, তার কার্যকারণ হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। তবে কাজের নিষেধাজ্ঞা তা থেকে আলাদা হওয়া সম্ভব এবং তার সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ দলীল থাকলে সেটা হবে স্বতন্ত্র ব্যাপার। যেমন হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সংগম নিষিদ্ধ হওয়ার কাজটি। আল্লাহ বলেন ঃ 'পাক-পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-সংগম করো না।'[৮৯] এক্ষেত্রে হুকুমের কার্যকারণ রহিত না হওয়ায় হুকুমটি প্রযোজ্য হবে। যেমন অনুমতিপ্রাপ্ত কাজের ওপর হুকুম প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এ কারণে এ দ্বারা প্রথমে স্বামীর জন্য বিবাহের বৈধতা, মহর আদায় করা এবং গর্ভধারণ পবিত্র করা প্রমাণিত হয়। তবে সতী সাধ্বী নারীদের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করা বাতিল হয় না। নিষিদ্ধকরণ যদি কথা ভিত্তিক হয় এবং কথাগুলো শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক আইনের ভিত্তিমূলক আহকামের কার্যকারণরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হয় এবং সেগুলো শরীয়ত সম্বন্ধে অনধিকার চর্চারূপে গণ্য হয় তাহলে এও তিন ধরনের হতে পারেঃ

প্রথম ঃ যে জিনিসের ওপর নিষিদ্ধ কথা প্রযোজ্য হবে তার স্বতঃই নিষিদ্ধ হওয়া। এমতাবস্থায় কথাটি গ্রহণ করা যাবে না। যেমন মৃতদেহের বিক্রি, স্বাধীন ব্যক্তির বেচাকেনা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ঃ কথা প্রয়োগের কারণে জিনিসটির স্বতঃই হালাল হওয়া। তবে জিনিসের ওপর আরোপিত প্রভাবটি কিন্তু হালাল। যেমন দূর সম্পর্কীয় খালা ও চাচীকে বিবাহ করা। মেয়েরা 'আকদ' এর বন্ধনে আবদ্ধ হলে স্বতঃই হালাল হয়ে যায়। আক্‌দ এর ফল কিংবা তার ওপর আরোপিত প্রভাব এমন বৈধতা অর্জন করে যা আক্‌দ করার আগে অর্জন করা যায় না।

তৃতীয় ঃ কথাভিত্তিক জিনিসটি গ্রহণযোগ্য তবে কথার অন্য একটি প্রভাবে তা অবৈধ হয়ে যায়। যেমন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনির্ধারিত মূল্যে পশু বেচাকেনা করা। বেচাকেনার আক্দ হওয়ায় পশুটি হালাল হলো এবং এ বেচাকেনার ফলে তা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ কিন্তু এখানে অন্য একটি প্রভাব জিনিসটি থেকে উপকৃত হওয়াকে ঠেকিয়ে রেখেছে। সেটা হলো মালিকানা সত্ব। (কেননা এ ধরনের বেচাকেনায় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না।)

তবে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে অন্য প্রভাবে কোনোকিছুই তাদের ওপর আরোপিত হবে না। প্রথম অবস্থায় হবে না সেটা আদৌ বৈধ না হওয়ার কারণে আর দ্বিতীয় অবস্থায় কোনো উপকার না থাকার কারণে। কারণ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া হলো হালাল বা বৈধ হওয়া। নিষেধের সাথে হালালের সংমিশ্রণ হয় না। কাজেই মাহরাম তথা যাদেরকে বিবাহ করা হারাম তাদেরকে বিবাহ করা অস্তিত্বহীনের ক্রয় বিক্রয়ের মতই বাতিল বলে গণ্য।

অবশ্য তৃতীয় অবস্থায় জিনিসটির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হওয়ার পশ্চাতে কারণ রয়েছে। সে কারণ হলো ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মালিকানা সত্ব থাকা কিন্তু এর প্রভাব হারাম হওয়া তখনো অব্যহত থাকে। তখন এ ধরনের মালিকানা অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যায়। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকে এই অসততা যথাসম্ভব দূর করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। হানাফীগণ এ ধরনের আকদকে ফাসেদ বা ক্ষতিকর আক্দ নামে অভিহিত করেছেন।এ ধরনের আক্দ মূলগতভাবে বিধিবদ্ধ হলেও গুণগত দিক দিয়ে বিধিবদ্ধ নয়। এ জন্য হানাফীগণ একে আক্দে ফাসেদ ও আক্দে বাতিল এ দুনামে অভিহিত করেছেন। যেক্ষেত্রে কার্যকারণের প্রয়োজন কিংবা নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের অপরিহার্যতা দেখা দেয় সেসব অবস্থায় এগুলো আরোপ করার অবকাশ রয়েছে, অন্যথায় নয়।

এ হচ্ছে হানাফীগণের পদ্ধতিগত দিকদর্শন।

এক্ষেত্রে অন্য উসূলবিদগণ ভিন্ন প্রকার রায়ও প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে নিষেধাজ্ঞার অর্থ হলো, কার্যকারণ সাধারণভাবে রহিত করার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। এই নিষিদ্ধকরণ হালাল করার বিচ্ছিন্ন বা বহির্ভূত কোনো বৈশিষ্টের দরুন হোক তা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়।

এমতের অনুসারী আলেমগণ জুমার আযান হওয়ার পর বেচাকেনাকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। কারণ আল্লাহ বলেছেন ঃ জুমার দিন যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় তখন বেচাকেনা ত্যাগ করে আল্লাহর যিকিরের দিকে দ্রুত চলে এসো।[৭০]

কালাম শাস্ত্রবিদগণের অধিকাংশের তৃতীয় একটি মত পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে ঃ বস্তুর নিষিদ্ধকরণ তার নিজ সত্তার জন্য বা তার অংশের জন্য অথবা তার কোনো গুণের জন্য হোক, যা তার অংশবিশেষের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, মূলত তার কারণ রহিতকরণে হস্তক্ষেপ বুঝায়। তবে নিষিদ্ধ বস্তুতে যদি বাইরের কোনো কিছু থাকে তাহলে নিষিদ্ধকরণ রহিত করণে হস্তক্ষেপ করবে না। কাজেই তাদের মতে মৃতদেহের বেচাকেনা করা, যার বিক্রিযোগ্য দ্রব্য হওয়ার অবকাশ নেই এবং

শরীয়ত প্রণেতার নিকট স্বীকৃতও নয় এমন কোনো শর্তযুক্ত বস্তুর বেচাকেনা করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় ধরনের বেচাকেনাই বাতিল। শরীয়তের হুকুম তথা মালিকানা সত্ব তার ওপর এ ধরনের বেচাকেনায় প্রযোজ্য হবে না। প্রথমটিতে মালিকানা সত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা উপকার সাধিত হয় না। অথচ তাদের মতে সত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং উপকার সাধিত হওয়া অত্যাবশ্যক। অন্যদিকে হানাফী কালামশাস্ত্রবিদগণ এই অত্যাবশকীয় সম্পৃক্ততা অস্বীকার করেন।
বিষয়টি বিতর্কিত হওয়ার কারণ হলো, নিষিদ্ধ বস্তুটি তার গুণগত কারণে কিংবা স্বতঃই নিষিদ্ধ হওয়া এবং এ অবস্থায় তার শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া।
যাদের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধকরণ শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক তারা বস্তুর নিষিদ্ধকরণ সহজাত কিংবা গুণগত হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না এবং এ সুবাদে বাতিল ও ফাসেদের মধ্যেও তারা পার্থক্য স্বীকার করে না। আর যাদের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধকরণ শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তারা বলেন, বাতিলের অস্তিত্বহীনতায় এবং হুকুম প্রণয়নের ক্ষেত্রে বস্তুর হারাম অব্যাহত থাকার কথা স্বীকার করেই নিষিদ্ধ বস্তুর ওপর কোনো কোনো হাদীস ভিত্তিক দলিল প্রযোজ্য হতে পারে।
এখানে মত পার্থক্যের দরুন বস্তুর হারাম নির্ধারণে কোনো বিরোধ নেই। অর্থাৎ হারাম পাওয়া গেলে এ ধরনের হারাম কাজ পরিত্যক্ত ও অগ্রহণযোগ্য হবে এবং তা সওয়াবের আশায় করা যাবে না। এ কারণে বিরোধ ফিরে আসবে মূলের দিকে। অর্থাৎ মূলের কোনো কোনো ফলাফল ও জাগতিক পরিণাম প্রয়োগ করা সম্ভব কি না এবং হারাম হওয়ার অস্তিত্ব বজায় রেখে প্রয়োগ করার সম্ভাবনা না থাকা। অবশ্য হারাম হওয়ার অস্তিত্বসহ পরকালীন ফলাফল প্রযুক্ত না হওয়ার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।
শরীয়ত প্রণেতার মহান উদ্দেশ্যসমূহ এখন স্বীকৃত ও প্রমাণিত এবং তাঁর উদ্দেশ্য বিরোধী কর্মতৎপরতা বাতিল ও পরিত্যক্ত তখন তাঁর এসব উদ্দেশ্যের পরিচয় লাভ করা বিশেষত ফকীহ মুজতাহিদদের জন্য অপরিহার্য।

মুজতাহিদের জন্য শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যসমূহের পরিচয় লাভ করার প্রয়োজনীয়তা এবং তার পন্থা

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, মানুষের কাজ শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছাবিরোধী হলে তা বাতিল হয়ে যায়। মানুষের কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেই শরীয়ত প্রবর্তিত হয়েছে। বিতর্কের ক্ষেত্রে এটা নির্ণীত হবে শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছানুসারে, বান্দার ইচ্ছানুসারে নয়। কারণ শরীয়তের লক্ষ হলো, মানুষকে তার প্রবৃত্তির বেড়াজাল থেকে বের করে আনা এবং তাকে আল্লাহর আদেশ নিষেধের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করানো, যাতে করে সে যথার্থ অনুগত হিসাবে পরিগণিত হতে পারে।
এ বাস্তবতার আলোকে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এমনভাবে অবগত হওয়া বান্দার জন্য জরুরী যার ফলে মানুষের উদ্দেশ্য শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের অনুগত ও অধীনস্থ হয়।

দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুকাল্লিদ (অন্যের উদ্ভাবিত বিধানের অনুসারী) হবে অথবা হবে মুজতাহিদ (নিজেই বিধান উদ্ভাবনকারী)। যদি সে সাধারণ একজন মুকাল্লিদ হয়, তাহলে মূলত শরীয়তের বিশদ ব্যাখ্যামূলক উদ্দেশ্যাবলীর সাথে পরিচয় লাভ করা ছাড়াই সে শরীয়তের বিধান মেনে চলবে। কারণ শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে পরিচিত হওয়া একটি জ্ঞানগত সূক্ষ্ম তত্ব। জ্ঞানের উচ্চ শিখরে পৌঁছে যাওয়া, অনন্য ধীশক্তির অধিকারী হওয়া এবং তীক্ষ্ণ ও সুদৃঢ় অনুধাবন ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া ছাড়া এ সূক্ষ্ম তত্ত্বের সাগরে সাঁতরানো সম্ভব নয়।

কাজেই এ ধরনের মুকাল্লিদের জন্য নেতৃত্ব দেয়ার মতো একজন নেতা, নির্দেশ দানের জন্য একজন হুকুম দাতা এবং অনুসরণ করার মতো একজন বিজ্ঞ আলেম দরকার। একজন সুস্থ জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য জ্ঞাতসারে কোনো ব্যাপারে অযোগ্য লোকের অনুসরণ করা বৈধ নয়। যেমন একজন রোগীর জ্ঞাতসারে নিজেকে চিকিৎসার জন্য এমন একজনের কাছে সমর্পণ করা অসম্ভব যে আদৌ চিকিৎসক নয়। তবে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।[৯১]

আর দায়িত্বশীল ব্যক্তি যদি মুজতাহিদ হয় তাহলে তিনি নস্ তথা কুরআন ও হাদীসের মৌল নির্দেশনামা, নিয়ম-কানুন ও মৌলিক উপাদান থেকে আহকাম উদ্ভাবন করে শরীয়তে সংযোজন করতে এবং ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল করতে পারেন। শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে এমন ব্যক্তির সুস্পষ্ট ধারণা হওয়া জরুরী। কারণ যেসব বিষয়ে তিনি ইজতিহাদ করবেন সেগুলোর দলীল সুস্পষ্ট নয়, যার সাহায্যে সেগুলোকে ফরযের মধ্যে গণ্য করা যায়। এ অবস্থায় চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যাবলীর সবচেয়ে নিকটবর্তী যে হুকুমটি পরিদৃষ্ট হবে সেটির অনুসরণ করা কর্তব্য হবে। প্রথমত মুজতাহিদের গবেষণালব্ধ নয় বরং শরীয়তের দলীল ভিত্তিক হুকুম মানতে হবে এবং পরবর্তীতে উদ্দেশ্যের কাছাকাছি গবেষণালব্ধ নির্দেশ মানতে হবে।

মুজতাহিদগণ শরীয়তে পাঁচ প্রকারের সংযোজন করেন

এক. কুরআন হাদীসে বর্ণিত যেসব শব্দ দলীলরূপে ব্যবহৃত সেগুলোর কাঠামোগত আভিধানিক তাৎপর্য গ্রহণ করেন এবং ফিকহী দলীলের দাবী অনুযায়ী ব্যাপকভাবে সেগুলো ব্যবহার করেন। উসূলবিদ আলেমগণ এ ধরনের বিশেষ বর্ণনার জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন। বস্তুত মুজতাহিদগণ শরয়ী উদ্দেশ্যাবলী সম্পাদনের অভিপ্রায়ে এ ধরনের বিবরণের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। অর্থাৎ শব্দের আভিধানিক অর্থকে গুরুত্ব দেন এবং আইনগতভাবে তা প্রয়োগ করেন।

দুই. আভিধানিক দাবী কিংবা শরয়ী প্রয়োগের দাবী থেকে শব্দটির নিরাপদ থাকার গুরুত্বের পর চিন্তা করতে হবে, সংশ্লিষ্ট দলীলসমূহ এবং পরিচয় লাভের সন্ধানে পরিপূর্ণ গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন দলীলগুলো দ্বন্দ্বমূলক কি না। এটা এজন্য করতে হবে, যাতে ধারণা করা যায় যে, ঐসব দলীল পরিচয় বা নিদর্শন বাতিল হওয়া থেকে মুক্ত এবং যা বাতিল হওয়ার যোগ্য তা 'মানসুখ' বা রহিত হয়ে গেছে। কিংবা সেগুলো সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট। দলীল দ্বন্দ্বমূলক বা সাংঘর্ষিক হওয়া থেকে মুক্ত হওয়ার ধারণা হলে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আর দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হলে একই সাথে দুটি দলীলকে অথবা একটির উপর অপরটিকে প্রাধান্য দিয়ে কাজের ধরন নির্ণয় করে নিতে হবে।[৯২]

উদ্দেশ্যাবলীর সাথে পরিচয় লাভের ব্যাপারে মুজতাহিদগণ ১ম প্রকারের চাইতে ২য় প্রকারের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী। কারণ একজন গবেষক গবেষণা কাজ করতে গেলে দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের সম্মুখীন হন। এ অবস্থায় গবেষক তার সামনে উপস্থিত দলীলসমূহ সম্পর্কে গবেষণার সময় যতটুকু স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ ধারণা নিজে লাভ করতে পারবেন তার ভিত্তিতে গবেষণা কাজটি দুর্বল কিংবা সবল হবে। গবেষক তার নিজের মনে দলীল সম্পর্কে যে পরিমাণ সন্দেহ বা দৃঢ়তা পোষণ করবেন সে অনুযায়ী দলীলের ভিত্তি গড়ে উঠবে। অর্থাৎ গবেষক যদি দ্বিধা ও বিতর্ক সম্পর্কে আশ্বস্ত হন তাহলে কোনো নির্দেশ প্রয়োগের জন্য দলীলকে যথেষ্ট মনে করবেন। আর পূর্ণ আশ্বস্ত না হওয়ার ক্ষেত্রে ধারণা দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক।

তিন. কারণ উদঘাটনের সকল পন্থায় প্রমাণিত শরীয়তের কারণগুলো চেনার পর শরীয়ত প্রণেতার উক্তিসমূহে যে হুকুম রদ করা যায় না তাকে অবতীর্ণ হুকুমের উপর অনুমান করা।[৯৩]

শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ চেনার ব্যাপারে এ ধরনের আলোচনার প্রতি মুজতাহিদগণের মুখাপেক্ষিতা স্বাভাবিক। কারণ অনুমান করা নির্ভর করে কারণসমূহ সাব্যস্ত হওয়ার উপর। শরয়ী উদ্দেশ্যাবলী চেনার জন্য কারণসমূহ প্রমাণ করা কখনো জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। যেমন পারস্পরিক সম্বন্ধ বজায় রাখা, ঝুলন্ত বিষয় বের করে দেয়া, ধারণাকে ইতস্ততভাব থেকে মুক্ত করা এবং পার্থক্যের বিলোপ সাধন করা। এ কারণে মুজতাহিদগণ প্রজ্ঞা বা কৌশল অবলম্বনের জন্য কারণকে একটি কানুন বা নিয়ম হিসেবে গণ্য করেছেন। ফলে শরয়ী হুকুমের কারণসমূহ উদ্দেশ্যাবলীর আওতাভুক্ত হয়ে যায়।

চার. কোনো কাজ বা জনগণের মধ্যে সংঘটিত কোনো ঘটনার জন্য নির্দেশ প্রদান করা, মুজতাহিদের কাছে প্রতীয়মান শরয়ী দলীলের মধ্যে এর হুকুম সম্পর্কে না জানা এবং এই হুকুমের ওপর অনুমান করার কোনো নজিরও না থাকা। শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান হওয়ার অভিপ্রায়ে একজন মুজতাহিদের জন্য এ ধরনের গবেষণা বা চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ এ ধরনের চর্চা করা শরয়ী আহকামের স্থায়িত্ব এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানার পর থেকে সৃষ্টির লয় পর্যন্ত সকল যুগ ও কালের জন্য তা সাধারণভাবে প্রযোজ্য হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে। ইমাম মালেক র. ও তাঁর অনুসারীগণ এ ধরনের চর্চাকে 'মাসলিহে মুরসালার' তথা প্রেরিত কল্যাণসমূহের দলীলরূপে গণ্য করেছেন। ইমামগণ বলেছেন ঃ এটা হলো শরীয়তের জরুরী অবস্থার আশ্রয়স্থল। তাঁরা এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এর প্রামাণ্যতা ও সৌন্দর্যকে। তাঁরা সবাই এর নাম দিয়েছেন 'মুনাসিব' তথা সময়োপযোগী বা যুগোপযোগী হাতিয়ার। ইমামুল হারমাইন এ ধরনের চর্চাকে আবার পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছন।[৯৪] 'কল্যাণ' অনুচ্ছেদে এর বিশদ বিবরণ জানা যাবে। যারা রায় বা যুক্তির ওপর নির্ভর করেন এবং যারা নস্‌ের দলীল ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে এ প্রকারটি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব রয়েছে।

পাঁচ. শরীয়তের আহকামের মধ্যে এ ধরনের গবেষণার নাম 'তাআব্বুদী' অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত ও সমর্পিত হওয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, শরীয়তের বিধিবদ্ধ আইনের রহস্য

ও তাৎপর্য উদঘাটন করতে গবেষক ও চিন্তাবিদদের আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হতে হয়েছে। এ অবস্থায় বিধিবদ্ধ আইনের প্রতি গবেষক তথা মানুষের অনীহা কিংবা সংশয় অথবা দুর্বলতা দেখা দেয়াটা মোটেই বিচিত্র নয়। অথচ শরীয়ত প্রণেতা মহান আল্লাহ্ প্রবর্তিত আইন রহস্য, তাৎপর্য, তত্ত্ব ও উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। কারণ তিনি আহকামুল হাকেমীন– সর্বোচ্চ হুকুমদাতা। তাঁর প্রবর্তিত আইন সত্য মহাসত্য। সত্য সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্থ থাকা মূর্খতা কিংবা বালখিল্যতার নামান্তর। এ অবস্থায় নিজের কালের সীমাবদ্ধতা এবং আল্লাহর আইনের অসীম ক্ষমতা ও সূক্ষাতিসূক্ষ্ম হওয়ার কথা চিন্তা করে সে হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ এবং নতি স্বীকার করে তাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিতে হয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে যতটুকু গভীরে পৌছুবে সেই অনুপাতে সে আত্মসমর্পিত ও নিবেদিত হতে পারবে। আলেমগণ শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলী বুঝার ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করেন।[৯৫]

আগের আলোচনা অনুযায়ী এটাই যখন প্রতিভাত হলো যে, শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যাবলী চেনার জন্য মুজতাহিদের ইজতিহাদী (গবেষণা) ও ইসতিমবাতী (উদ্ভাবন) শক্তির আশ্রয় নেয়া প্রয়োজন তখন প্রশ্ন জাগে কিভাবে উদ্দেশ্য জানা যাবে এবং তা জানার কোনো উপায় আছে কি? (চলবে)

তথ্যপঞ্জি

৭৭. সূরা আদ্ দুখান, ৩৮-৩৯ নং আয়াত।
৭৮. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ১২৩ নং আয়াত।
৭৯. ঐ
৮০. ঐ
৮১. ঐ এবং জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ৫১-৫২ পৃষ্ঠা।
৮২. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ৫১ পৃষ্ঠা, ই'লামুল মুকিয়ীন, ৩ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা এবং ২ খণ্ড, ১২৩, আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা।
৮৩. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা। কাররাফী, আল ফুরুক, ২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।
৮৪. সূরা আন নিসা, ১১৫ নং আয়াত।
৮৫. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা।
৮৬. উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে ইমাম বুখারী হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।
৮৭. বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েত এবং রেওয়ায়েতের শেষ অংশটুকু মুসলিমের।
৮৮. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ৫১-৫২ পৃষ্ঠা এবং ১০ ও ১১ পৃষ্ঠা, মুসলিমের উপর ইমাম নববীর শরাহ, ১৩ খণ্ড, ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা।
৮৯. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড ১২০ পৃষ্ঠা এবং জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ৫২ পৃষ্ঠা।
৯০. ঐ
৯১. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ৫৪ পৃষ্ঠা মুসলিমের উপর............... ইমাম নববীর শারাহ, ১৩ খণ্ড, ৪৯-৫০ পৃষ্ঠা, মিসরের আযহারে মুদ্রিত।
৯২. ইলামুল মুকিয়ীন, ২ খণ্ড, ১২৩-১২৪ পৃষ্ঠা।
৯৩. ইমাম মুসলিম আবু হুরাইরা (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, আত তাজুল জামে' লিল উসূলে ফী হাদীসির রসূল, ১ খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা।
৯৪. সূরা আল কাহ্ফ, ১১০ নং আয়াত।
৯৫. সূরা আল বাইয়্যেনাহ, ৫ নং আয়াত।

অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, পৃষ্ঠা : ৭৩-৭৭

ইসলামে পানি আইন ও বিধি বিধান

মুহাম্মদ নূরুল আমিন

চার

ইসলামী আইনে নদী-নালা ও জলাশয় সংরক্ষণের ওপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সাধারণ নীতি অনুযায়ী খাল-বিল, নদী-নালাসহ জলাশয়ের সংরক্ষণের প্রাথমিক দায়িত্ব দুই পাড়ের পানি ব্যবহারকারী ভূমি মালিকদের ওপর বর্তায়। তারা যৌথভাবে এই সংরক্ষণ ও সংস্কার কাজের জন্য দায়ী; তৃষ্ণা নিবারণের অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা জলাশয় সংরক্ষণের ব্যয় পরিশোধে বাধ্য নন। অবশ্য উলামায়ে কেরামের মধ্যে এক্ষেত্রে মতের কিছুটা পরিবর্তনও লক্ষণীয়।

সুন্নী উলামায়ে কেরাম

ক. নদী সংরক্ষণ : বড় বড় নদী তথা তাইগ্রীস, ইউফ্রেতিস ও নীল নদকে সামনে রেখে মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এসব নদী-নালার খনন, পুনঃখনন, সংরক্ষণ ও সংস্কার কাজের ব্যয়ভার বহন করবে এবং বায়তুল মাল হবে এ ব্যয়ের প্রধান উৎস। বলা বাহুল্য বায়তুল মালের এখানে দু'টি উৎস প্রদর্শন করা হয়েছে; একটি হচ্ছে খারাজ, আধুনিক পরিভাষায় যাকে শুল্ক, রাজস্ব, ভূমি রাজস্ব, খাজনা বা কর হিসেবে অভিহিত করা হয়। অপরটি হচ্ছে জিযিয়া, যা বিজিত ভূমি বা অঞ্চলের অমুসলিমদের উপর আরোপ করা হয়। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে জলাশয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে 'করদাতাদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করতে পারবে না। কাল পরিক্রমায় সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে নদী অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের উপর নদীর সংশ্লিষ্ট অংশের সংস্কার ও সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়।

খ. খাল সংরক্ষণ : নৌকা বা জাহাজ চলাচলের উপযোগিতার ভিত্তিতে খালকে এক্ষেত্রে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, নাব্য খাল ও অনাব্য খাল। যদি নদীর তীরের বাসিন্দারা সংস্কার ও সংরক্ষণ কাজে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সরকার আইন করে নাব্যতা নির্বিশেষে উভয় প্রকার খাল সংরক্ষণে তাদের বাধ্য করতে পারেন। তবে হানাফী মযহাব অনুযায়ী নাব্যতা বহির্ভূত খাল সংস্কারের বেলায় উপকার ভোগীদের মধ্যে যারা সংস্কার ব্যয় বহন করবেন না ব্যয় বহনকারী ব্যক্তিরা সরকারি অনুমোদন নিয়ে তাদেরকে খাল ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে

লেখক, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং গবেষক।

পারেন।[১] অবশ্য মালেকী মযহাবের দৃষ্টিতে তীরের মালিকদের মধ্যে যারা সংরক্ষণ কাজে অংশগ্রহণ করবেন না তারা পানির অধিকার হারাবেন না, সংরক্ষণ ও সংস্কার কাজের পূর্বে যে পরিমাণ পানি পাওয়া যেতো সে পরিমাণ পানি তারা দাবী করতে পারবেন। সংস্কারের ফলে প্রাপ্ত অতিরিক্ত পানি এই কাজে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টনযোগ্য।[২]

গ. সংরক্ষণ কাজ : নদী বা খালের উজান থেকে শুরু হয়ে ভাটির দিকে অগ্রসর হবে এবং তীরবাসীদের প্রত্যেকের জমিকে স্পর্শ করবে। সেচাধিকারের অনুপাতে উভয় তীরের সকল কৃষককে সংরক্ষণ সংক্রান্ত সকল ব্যয়ভার বহন করতে হবে।[৩]

হানাফী মযহাবের মতে পানি প্রণালীর যে অংশ তাদের জমির উপর কিংবা পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তীরের বাসিন্দারা শুধুমাত্র সে অংশের সংরক্ষণ ব্যয় বহন করবেন, অপরাংশের ব্যয় তারা বহন করবেন না, সরকারিভাবে তা বহন করা হবে। কাজেই যদি ১০ জনের যৌথ মালিকানার কোনও সেচ খাল সংস্কার করা হয় তাহলে উজানের মালিকরা তাদের জমি সন্নিহিত এলাকার সংস্কার করবেন, ভাটির মালিকরা তাদের জমির উপর অথবা পাশ দিয়ে প্রবাহিত অংশের ব্যয়ভার বহন করবেন। খালের গতিপথে এমন কোনও এলাকা যদি থাকে যেখানে সুবিধাভোগী কৃষকদের সেচাধীন জমি নেই তাহলে উক্ত অংশের সংস্কারের জন্য সরকার দায়ী থাকবেন।[৪]

খারিজীদের মতে খাল সংরক্ষণের দায়িত্ব পানির মালিকের, জমির মালিকের নয়। তবুও যদি ভূমি মালিকরা প্রাথমিকভাবে সংরক্ষণ কাজ শুরু করে থাকেন তাহলে পানি ও ভূমি মালিক উভয়কেই পরবর্তীকালে যৌথভাবে সংরক্ষণ ব্যয় বহন করতে হবে।[৫]

পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে যারা সংস্কার কাজে ইচ্ছুক তারা বিরোধিতাকারীদের এই ব্যয় বহনে বাধ্য করতে পারেন তবে শর্ত এই যে তারা খাল বা নদীর পুনঃখনন প্রক্রিয়ায় মূল গভীরতাকে অতিক্রম করবেন না কিংবা অতিক্রম করলেও তাদের প্রাপ্য পানির চেয়ে অতিরিক্ত পানি দিতে বাধ্য থাকবেন।[৬]

ভূমি স্বত্ব ও পানির অধিকার

ইসলামের পানি আইন ও বিধিমালা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে এর ভূমি স্বত্ব পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। কেননা ইসলামে ভূমি আইনের সাথে পানি আইনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মুসলিম আইনে দেওয়ানী আইন থেকে আলাদা কোনও প্রশাসনিক আইন বিকশিত হয়নি এবং ফিকাহ শাস্ত্রে সরকারি সম্পত্তি (Public domain) বলে কোনও বস্তুর উল্লেখ নেই। বলা প্রয়োজন যে, রেডিমেড কোনও প্রশাসনিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি, প্রচলিত প্রথাকে ইসলামীকরণের মাধ্যমে তা গড়ে উঠেছে।

মুসলিম ভূমি আইনে ভূমি মালিকানার শর্তাবলী বর্ণিত রয়েছে। খেলাফতের সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন দেশ বিজয়ের পরবর্তী শতাব্দীসমূহে এই আইনের বিকাশ ঘটে। ইসলামে ভূমি আইনের মৌলিক বৈশিষ্টসমূহকে বাইজেন্টাইন আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। ঐ আইনে

সম্পত্তির চূড়ান্ত মালিকানা শাসন কর্তার ওপর অর্পিত ছিল এবং এই সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতাও রাষ্ট্র ভোগ করতো।

প্রশাসনিক প্রয়োজন ও সামরিক বাহিনী এবং রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের চাহিদা দ্বারা ইসলামের ভূমি আইন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। দেশ জয়ের পর মুসলিম শাসকরা ভূমির উপর চাষীদের স্বত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছেন, মধ্যস্বত্বভোগী দালাল ও ভূস্বামীরা এক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ হারিয়েছে। ভূস্বামীদের কাছ থেকে অধিগ্রহণকৃত জমি চাষীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে এবং চাষীরা এই জমি হস্তান্তরের অধিকারও পেয়েছেন।

ভূমি বন্টন ও রায়তি স্বত্ব প্রতিষ্ঠার পর রসূল স. প্রদত্ত দিক নির্দেশনা ও দৃষ্টান্তের আলোকে ভূমি রাজস্ব পদ্ধতিও চালু করা হয়। এই উদ্দেশ্যে মোট জনসংখ্যাকে মুসলিম, অমুসলিম এই দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। মুসলমানরা জমির খাজনা হিসেবে ওশর প্রদান করতেন। এই ওশরের পরিমাণ উৎপাদিত ফসলের মূল্যের পাঁচ থেকে দশ শতাংশের মধ্যে বিস্তৃত ছিল এবং এই হার জমির সেচ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল ছিল। অমুসলিমরা খারাজ বা ভূমি রাজস্ব পরিশোধ করতেন। মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্য তাদেরকে জিজিয়া নামক এক প্রকার করও প্রদান করতে হতো। এভাবে মুসলিম আইন কৃষিস্বত্ব, যৌথ মালিকানা, উত্তরাধিকার স্বত্ব, রায়তি স্বত্ব ও ব্যক্তি মালিকানার তুলনায় ভূমি করের শ্রেণী বিন্যাসের উপর (land tax classification) অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছে।

মুসলিম উম্মাহর প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা রাষ্ট্র প্রধানকে কখনো ইমাম, কখনো খলিফা, আবার কখনো সুলতান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে নীতিগতভাবে ইমামরা কখনো বেসরকারি জমিতে সেচের পানি বন্টন নিয়ন্ত্রণের বৈধ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত বেসরকারি সম্পত্তি হিসেবে পানির ওপর তাদের কর্তৃত্ব বিস্তৃত ছিল।

ইসলামী আইন অনুযায়ী ভূমিকে দু'টি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এগুলো হচ্ছে, 'মুলক' সম্পত্তি ও 'মিরি' সম্পত্তি।

'মুলক' সম্পত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত বা বেসরকারি সম্পত্তি যার মধ্যে বিক্রি বা হস্তান্তরের পরিপূর্ণ অধিকারসহ ব্যক্তিগত ভূমি মালিকানা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইরান ও মিসরে একে 'মিলকি' সম্পত্তিও বলা হয়ে থাকে।

'মিরি' সম্পত্তি হচ্ছে যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি। ফিলিস্তিন, তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক এবং মিসরে এই সম্পত্তি 'মিরি' হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তান এবং ইরানে এই সম্পত্তিকে 'খালিশা' সম্পত্তি বলা হয়। এই ধরনের মালিকানায় প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে এতে ভূমির চূড়ান্ত মালিকানা রাষ্ট্র ভোগ করে, অস্থায়ী মালিক এই সম্পত্তি বিক্রি বন্ধক কিংবা ভাড়া দিতে পারেন, তবে তিনি উইল বা হেবানামা করে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তা দান করতে পারেন না। তার যদি কোনও উত্তরাধিকারী না থাকে তাহলে জমির মালিকানা সরকারের নিকট ফেরত যায়। উল্লেখ্য প্রাথমিক অবস্থায় এই সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের বিধান ছিল না; সরকার ভূমি ব্যবহার

তদারক করতেন, পরে এর সংশোধন করা হয়। চাষাবাদের জন্য প্রদত্ত জমিতে চাষাবাদ বাধ্যতামূলক ছিল এবং ভূমি বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এজন্য কর পরিশোধ করতে হতো। এই জমির হস্তান্তর আইনসিদ্ধ হবার জন্য রাষ্ট্র বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক সত্যায়ন অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধরনের যৌথ মালিকানা প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

ক. মাওয়াতানা, মেওয়াতা অথবা মুসাআ ঃ এগুলো হচ্ছে মালিকবিহীন অকেজো বা পতিত জমি, লেবানন, সিরিয়া, জর্দান সৌদি আরব এবং ইরাকসহ আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের প্রচুর জমি রয়েছে। একটি গ্রাম বা গোত্রের মালিকানাধীন এই ধরনের সম্পত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আংশিক দখলী স্বত্ব পেয়ে থাকেন, এখানে ব্যক্তির একক মালিকানা নেই। আবর্তনের একটা পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক বছর দখলী স্বত্ব পাওয়ার মাধ্যমে এই জমি ভোগ দখলের সুযোগ পেতেন। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক বা খলিফা কোনও নাগরিকের অনুকূলে অনুদান হিসেবে সম্পত্তি মঞ্জুর করতে পারেন অথবা তাকে আলাদাভাবে জমি ও পানির স্বত্ব মঞ্জুর করতে পারলেও এ ব্যাপারে বিভিন্ন মযহাবের বিভিন্ন রকমের রায় রয়েছে। যেমন হানাফীরা দাবী করেন চাষাবাদ ছাড়া অন্য কোন কাজে এই জমি বরাদ্দ যোগ্য নয়, এমনকি তা করার ক্ষমতা রাষ্ট্র প্রধানেরও নেই। পক্ষান্তরে মালেকী মযহাবের মতে রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি নিয়ে এই জমি ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা যেতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে বরাদ্দ গ্রহীতা ভূমি উন্নয়নের লক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ ও শ্রম ব্যয় করবেন।[৬]

খ. খারাজ অথবা বিজিত ভূমি ঃ এই শ্রেণীর জমিতে চাষাবাদ হয় এবং উর্বতার কারণে এই জমি বেশ উৎপদানশীল। এর ওপর খারাজ বা ভূমি কর আরোপ করা হয়ে থাকে। মুসলিম উম্মাহর সম্পত্তি হিসেবে এই জমি ব্যবহারে আনা কিংবা পরিচালনার দায়িত্ব খলিফা বা রাষ্ট্র প্রধানের। এই জমির মালিক নীতিগতভাবে সম্পত্তির পূর্ণ স্বত্ব ভোগ করেন না;' তিনি শুধুমাত্র সম্পত্তির আয় ভোগ করতে পারেন। এসব জমিতে সেচের পানি সরবরাহের যাবতীয় কাজ কর্ম ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সম্পাদন করতেন।

গ. ওয়াকফ ঃ এই ভূমির মালিকানা রাষ্ট্রের ওপর অর্পিত হয়। তবে তার যাবতীয় আয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, কবরস্তান প্রভৃতির পরিচালনা ও উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হয়।

'মিরি' সম্পত্তির আরো পাঁচটি শ্রেণী আছে। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে মিরিখালি (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খালি জমি), মিরি তাহাত আত তাসারুফ (বেসরকারিভাবে সম্পত্তির আয় ভোগ করার অধিকার সম্পন্ন সরকারি জমি) মিরি মাতরুকা মুরেফাকাফ (সরকারি জমি কিন্তু আয় ভোগ করে সমাজ), মিরি মাতরুকা মাহমিয়া (জনস্বার্থে ব্যবহৃত সরকারি জমি, যেমন রাস্তা ঘাট, বিনোদন কেন্দ্র, পার্ক, খোলা মাঠ, ইত্যাদি) এবং মাবলুল (সরকারের অনুকূল বাজেয়াপ্ত কৃত জমি)।

মুসলিম দেশসমূহে প্রচলিত পানি আইন ও বিধি-বিধান আলোচনা করার আগে ভূমি ও পানি মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এসব দেশে বিদ্যমান প্রথা পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা নেয়া প্রয়োজন। কেননা এই রেওয়াজ, প্রথা ও পদ্ধতি গুলোই আইনের বিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। পানি ও সেচ আইনের ভিত্তিও ছিল স্থানীয় প্রথা; অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিস্তারিতভাবে প্রণীত এই বিধি-বিধানগুলো জটিল হলেও এমন কি সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতেও এগুলোর বাস্তবতা ও কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি।

স্থানীয় রেওয়াজকে প্রয়োগ করতে গিয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যে সমস্ত জটিলতা ও সমস্যা দেখা দিয়েছিল আইনী প্রক্রিয়ায় সেগুলো কিভাবে সমাধান করা হয়েছিল এ আলোচনার কোডিফিকেশন পর্যায়ে সে সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করবো।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Ali Ibn Abi Bakr, Burhan Al Din al Marginani, Commentary on Musalman Land, Page 615, Ibn Abedin, Precis de Juriprudence Musalman, Volume V, Page 436.
2. Malek bin Anas, op. at vd, xv Pp 193-94.
3. Ibn Abedin op at vol-v, P 437.
4. Op at Vol. V, P 434.
5. Felim E. Maghab land Legislation in blan Trans, Perres Article 62.
6. Op. at Article 31, 32.

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, পৃষ্ঠা : ৭৮-৮৫

ইসলামে বিয়ে ও বিয়ের আইন কানুন

মওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী

বিয়ে সম্পর্কিত মৌলিক আইন

ইসলামে বিয়ে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বিয়ের আইনগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আসলে কোনো আইন যখন প্রণয়ন করা হয় তখন ঐ আইনটি প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ হয় না। বরং কোনো উদ্দেশ্যে ও লক্ষ অর্জনের জন্য আইনটি নিছক একটি মাধ্যমে পরিণত হয়। তাই বিয়ের মাধ্যমে ইসলাম যে উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করতে চায়[১] সেগুলো অর্জনের অপরিহার্য মাধ্যম হিসাবে সে বিয়ে সম্পর্কিত আইনগুলো প্রণয়ন করেছে, এতে দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারে না। বিয়ে সংক্রান্ত ইসলামী আইন অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করার সময় তার এই চিন্তাগত পটভূমি অবশ্যই সামনে রাখতে হবে।

কোনো বিধিবদ্ধ আইনে তার মৌলিক ধারাগুলোই সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী হয়। সেগুলো থেকেই তার মৌল বক্তব্য, দাবী, মেজাজ, দোষ গুণ সবকিছুই অনুমান ও অনুধাবন করা যেতে পারে। বরং অন্যভাবে বলা যায়, সঠিক অনুমান আসলে সেগুলোর গভীর অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার ওপর নির্ভর করে। তাই ইসলামী শরীয়তে যে আইনগুলো বিয়ের বুনিয়াদি ও মৌল বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট আমরা এখানে কেবলমাত্র সেগুলোর মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। সেগুলো হচ্ছে :

এক. সমধর্মাবলম্বী হওয়া বিয়ে জায়েয হওয়ার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

দুই. আহলি কিতাব নারীর সাথে মুসলিম পুরুষের বিয়ে অনুমোদিত।

তিন. বালেগ মেয়ে ও মহিলাদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের শরীয়তসম্মত অলীদের (অভিভাবক) মতামতও এক পর্যায়ের গুরুত্বের অধিকারী।

চার. নাবালেগদের বিয়েরও অনুমতি আছে।

পাঁচ. পুরুষের নারীর 'কুফু' হতে হবে।

ছয়. নারীর যথাসঙ্গত মোহরানা লাভ করা জরুরী।

সাত. বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার জন্য সাক্ষী ও ঘোষণা দেয়া অপরিহার্য।

এই মৌলিক বিধানগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় এবার আমরা আসতে পারি।

লেখক : আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও একজন বরেণ্য ভারতীয় আলেম।

এক. বিয়ে জায়েয হওয়ার জন্য সমধর্মী হওয়ার শর্ত

শর্তের অপরিহার্যতা ও ব্যাপকতা : আইনগত ও শরীয়ত সম্মতভাবে বিয়ে সঠিক ও জায়েয হওয়ার জন্য প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে ছেলে ও মেয়ে এবং নারী ও পুরুষ উভয়ের মুসলমান হওয়া।[২] কুরআন মজীদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, 'হে মুসলমানরা! মুশরিক মেয়েদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে, তাদের সৌন্দর্য তোমাদের যতই বিমুগ্ধ করুক না কেন। আর মুশরিক ছেলেদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে, তাদের সৌন্দর্য তোমাদের যতই বিমুগ্ধ করুক না কেন।' (আল বাকারা : ২২১)

আর এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'এই (মুমিন) মেয়েরা ওদের (কাফের পুরুষ) জন্য হালাল নয় এবং ঐ (কাফের) পুরুষরা ওদের (মুমিন মেয়ে) জন্য হালাল নয়। আর হে মুসলমানরা! কাফের মেয়েদের সম্ভ্রম নিজেদের দখলে রেখো না।' (মুমতাহিনা : ১০)

আল্লাহর এ বাণী সুস্পষ্টভাবে জানান দিচ্ছে বিয়ে হালাল হবার জন্য একই ধর্মাবলম্বী হওয়া একান্ত জরুরী। কোনো মুসলমান পুরুষ কোনো কাফের ও মুশরিক মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না এবং কোনো মুসলমান মেয়ে কোনো মুশরিক ও কাফের পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না। এটা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, এই ধরনের কোনো বিয়ে হয়ে গেলে তাকে বিয়ে হিসাবে গণ্য করা হবে না। অন্য কথায় বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়নি বলে ধরা হবে। ফিকহের পরিভাষায় এটি 'বাতিল' গণ্য হবে।[৩] এই ধরনের তথাকথিত বিয়ের ফলে মেয়েটি পুরুষের এবং পুরুষটি মেয়ের জন্য হালাল হবে না। তাদের থেকে যে সন্তানের জন্ম হবে তাকেও জায়েয বৈধ ও সঠিক বংশধারা সমৃদ্ধ সন্তানের স্বীকৃতি দেয়া যাবে না এবং তারা একে অন্যের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারীও হবে না।

এই আয়াতগুলোতে 'মুশরিক নারী' ও 'মুশরিক পুরুষ' এবং 'কাফের নারী' ও 'কাফের পুরুষ' শব্দগুলোর ব্যবহারের কারণে এ কথা মনে করা মোটেই সঙ্গত হবে না যে, যদি কোনো অমুসলিম এমন হয় কোনো কারণে যার ওপর 'মুশরিক' বা 'কাফের' পরিভাষার ব্যবহার ঠিক খাপ খায় না তাহলে তাকে এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা যাবে এবং তার সাথে মুসলমানের বিয়ে জায়েয হবে। না, একথা মোটেই ঠিক নয়। মুসলমান ও ইসলামের আওতার বাইরের সকল লোকই এই নিষেধাজ্ঞার অন্তরভুক্ত। কারণ যে কার্যকারণের ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে সকল অমুসলিমের মধ্যে তা সমানভাবে বিরাজ করছে। যে কোনো পারিভাষিক নামধারী অমুসলিম গোষ্ঠী দল বা জাতির সাথে তারা সম্পর্কিত হোক না কেন তাতে কোনো পার্থক্য সূচিত হবে না। কাজেই বিয়ে জায়েয নাজায়েয হবার ব্যাপারে তাদের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো কারণ নেই। নিষিদ্ধ করার কারণ এবং তার চূড়ান্ত লক্ষ যখন সবজায়গায় একই পর্যায়ে বিরাজমান তখন এই নিষেধাজ্ঞার বিধানও সবার ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। কাজেই উল্লেখিত আয়াতগুলোর 'যে পর্যন্ত না সেই মেয়েরা ঈমান আনে' এবং 'যতক্ষণ না সেই পুরুষরা ঈমান আনে' শব্দাবলী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথাই ঘোষণা করছে যে, কোনো ইসলাম অস্বীকারকারী ব্যক্তির সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন

কেবলমাত্র তার ইসলামের প্রতি ঈমান আনার পরই জায়েয হতে পারে। অর্থাৎ অন্যকথায় বলা যায়, যে কোনো ধরনের অমুসলিম ইসলামের মধ্যে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে না। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে এ আয়াতগুলোতে বিয়ে নিষিদ্ধ করার জন্য বিশেষ করে 'মুশরিক পুরুষ' ও 'মুশরিক নারী' এবং 'কুফ্ফার' ও 'কাওয়াফের'-এর পারিভাষিক শব্দগুলো ব্যবহার করা হলো কেন? কোনো সার্বিক ও অর্থসম্পন্ন শব্দ ব্যবহার করে সব অমুসলিমদের সাথে এই নিষেধাজ্ঞাকে সম্পৃক্ত করা হলো না কেন? এর জবাব হচ্ছে, এই আয়াতগুলো নাযিলের সময় প্রকৃতপক্ষে এই পারিভাষিক মুশরিক ও কাফেররাই সামনে ছিল। তাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার ও স্থাপন করার বিষয়টিই আলোচিত হচ্ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ দেবার সময় বিশেষ করে কেবলমাত্র, তাদেরই নাম নেয়া হতো, যদিও এটি ছিল একটি ব্যাপকভিত্তিক ও মৌল নীতিগত নির্দেশ।

কোনো অমুসলিমের সাথে মুসলমানের বিয়ে যেমন হতে পারে না এবং হয়ে গেলে তা বাতিল ও অস্তিত্বহীন গণ্য হবে ঠিক তেমনি কোনো অমুসলিম দম্পতির মধ্য থেকে যদি একজন ইসলাম গ্রহণ করে এবং অন্যজন তার পূর্বের ধর্মের ওপর অপরিবর্তিত থাকে তাহলে ইসলামী মূলনীতির সুস্পষ্ট দাবী অনুযায়ী তাদের উভয়ের বিয়ে অপরিবর্তিত থাকবে না।[৪]

কোনো কোনো অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বিয়ে ভেঙে যাবে।[৫] অথবা কাজী তাকে অস্তিত্ববিহীন বলে ঘোষণা করবে[৬] এবং কোনো কোনো অবস্থায় স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তা বাকী থাকবে। এই অন্তরবর্তীকালে যদি দ্বিতীয় পক্ষও ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিয়ে অপরিবর্তিত থাকবে অন্যথায় নিজে নিজেই খতম হয়ে যাবে।[৭] ঐ কাফেররাও আর এই মেয়েদের জন্য হালাল নয়। আর তারা (এই মুসলমান হয়ে যাওয়া) মেয়েদের ওপর (মোহরানা বাবদ) যা খরচ করেছিল তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। এইসব মেয়েদেরকে তাদের মোহরানা আদায় করে বিয়ে করলে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না। আর অনুরূপভাবে তোমরাও নিজেদের কাফের স্ত্রীদেরকে তোমাদের কাছে আটকে রেখো না। তোমরা (মোহারানা হিসাবে) যা কিছু তাদের ওপর খরচ করেছিলে তা তাদের কাছ থেকে ফেরত চেয়ে নাও। আর যা কিছু কাফেররা তাদের (মুসলমান হয়ে যাওয়া) স্ত্রীদের ওপর খরচ করেছিল তা যেন তারা তাদের কাছ থেকে ফেরত চেয়ে নেয়। এটা আল্লাহর ফয়সালা। তিনি তোমাদের মধ্যে এ ফয়সালা করেছেন। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি বিচক্ষণ ও জ্ঞানময়।' (মুমতাহিনা ১০)

আল্লাহর এ ফরমান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে যে, কোনো অমুসলিম স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় জন পূর্ববৎ তার পূর্ব পুরুষের ধর্মে অবিচল থেকে যায় তাহলে কেবল তাদের বৈবাহিক সম্পর্কই এখন আর জায়েয ও আইনসঙ্গতই থাকছে না বরং ধর্মের এই বিভিন্নতার সাথে সাথে যদি 'দেশে'রও বিভিন্নতা দেখা দেয় অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণকারী যদি দারুল কুফর থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয়জন তার

পূর্বের নাগরিকত্ব বহাল রাখে তাহলে তাদের দুজনের বিয়ে আপনা আপনিই অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। তাকে অকার্যকর করার জন্য কোনো তালাক বা আদালতী ফরমানের প্রয়োজন হবে না। তখন আইনত নারী ও পুরুষ উভয়ই তাদের ইচ্ছামতো যে কাউকে বিয়ে করতে পারে।[৮]

মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো একজন যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তখন তাদের অবস্থাও হয় একই পর্যায়ের। কারণ এ অবস্থায়ও তাদের দুজনের মধ্যে ইসলাম ও গায়ের ইসলামের দূরতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই তাদের বিবাহ বন্ধনও অটুট থাকে না। ঠিক যেমন কোনো অমুসলিম স্বামী স্ত্রীর একজন ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের বিয়ে অটুট থাকে না বরং তৎক্ষণাত অথবা স্ত্রীর ইদ্দত খতম হতেই তা ভেঙে যায়।[৯]

মোট কথা ইসলামী শরীয়তে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে বৈধ ও আইনসঙ্গত সম্পর্ক হিসাবে স্বীকৃতি দেবার জন্য একই ধর্মাবলম্বী হওয়া একটি স্বতন্ত্র ও স্থায়ী শর্ত। এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবার সময়ও এই শর্তটির উপস্থিতি জরুরী এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত ও অব্যাহত রাখার জন্যও জরুরী।

কারণ ও কল্যাণকর দিক

বিয়ের বৈধতার জন্য সমধর্মিতার অপরিহার্য শর্ত আরোপ করার কারণস্বরূপ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সামনে রাখতে হবে :

এক. ঈমানের হেফাজত : এটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মৌলিক, সুস্পষ্ট ও সিদ্ধান্তকারী কারণ হিসাবে কুরআন মজীদ নিজেই যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছে। সূরা বাকারার ২২১ আয়াতের যে শব্দগুলো ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে এবং যেখানে 'মুশরিক নারী ও পুরুষের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ঠিক তার পরই বলা হয়েছে, 'এরা (মুশরিকরা) তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে অন্যদিকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে আহ্বান করছেন নাজাত ও ক্ষমার দিকে। তিনি মানুষের জন্য নিজের বিধান ব্যক্ত করেন সুস্পষ্টভাবে, যাতে তারা তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।' (বাকারা- ২২১)

অর্থাৎ এই নিষিদ্ধকরণের আসল উদ্দেশ্য ও প্রকৃত কারণ হচ্ছে মুমিনের ঈমানের সম্পদকে হেফাজত ও সংরক্ষণ করা। যেহেতু যারা ইসলামকে নিজেদের ধর্ম ও জীবন বিধান বলে স্বীকার করে না তাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মতো স্থায়ী ও গভীর অনুভূতিশীল আবেগময় সম্পর্ক স্থাপন করায় মুসলমানের ধর্ম ও ঈমানকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে তাই তাদের সাথে এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপনকে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এই ধরনের বিষয় মুসলমানের ঈমানের সম্পদকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে, এটি নিছক কোনো সন্দেহ বা কল্পনা মিশ্রিত বিষয় নয় বরং এটি একটি সুস্পষ্ট ও দিনের আলোর মতো জাজ্বল্যমান অনস্বীকার্য সত্য। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কোনো সাময়িক, সাধারণ বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক নয়। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কোনো একটি বিশেষ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। এই সম্পর্ক তাদের ব্যক্তিগত চিন্তা ও মানসিক প্রবণতাকে আচ্ছন্ন ও প্রভাবিত করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে। এটি এমন একটি অসাধারণ সম্পর্ক যা একদিকে যেমন স্বতন্ত্র, স্থায়ী ও সীমানাবিহীন

তেমনি অন্যদিকে চূড়ান্ত গভীর, আবেগময় ও সুদীর্ঘকালীনও। একান্ত স্বাভাবিক পদ্ধতিতে এটি স্বামী ও স্ত্রীকে দুধ ও চিনির মতো মিশিয়ে দিতে চায়। তারা যাতে নিজেদের পছন্দ আবেগ অনুভূতি এবং চিন্তা চেতনায় বেশি বেশি একে অন্যের কাছাকাছি এসে যেতে থাকে সেজন্য অনবরত ও লাগাতার জোর দিতে থাকে। এই জাজ্বল্যমান সত্যের উপস্থিতিতে তাদের মধ্যে চিন্তার আদান প্রদানের মাধ্যমে সূক্ষ্মতম অনুপ্রবেশ জারি থাকা কোনো অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। তাই অমুসলিম জীবন সঙ্গী বা জীবন সঙ্গিনীর তার মুসলিম জীবন সাথীকে নিজের ইসলাম বিরোধী আকীদা ও চিন্তায় প্রভাবিত করার বিপদটাকে ছোট করে দেখার কোনো কারণ নেই। মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যিনি একটুও অবহিত ও সজাগ তিনি বিষয়টি স্বীকার না করে পারেন না।

তারপর ঈমান ও ইসলামের ধ্বংসের এই বিপদ কেবল ঐ পুরুষ বা নারীর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না যে একজন ইসলাম অস্বীকারকারীকে বিয়ে করেছে বরং অনিবার্যভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে তার সন্তানদেরকেও এর আওতায় নিয়ে নেবে। তারপর কিছুই বলা যায় না পরিণতি কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে। তারা বিপরীত আকীদার শিকারও হতে পারে আবার কুফর, শিরক ও নাস্তিকতার কোলেও ঢলে পড়তে পারে। মুসলিম ও গায়ের মুসলিম দম্পতির সন্তানরা কিভাবে তাদের গায়ের মুসলিম মা বাবার আকীদা ও চিন্তার বলয় থেকে পুরোপুরি সংরক্ষিত থাকবে? তাদের মানসিক গঠনে ঐসব আকীদা ও চিন্তা ছায়াপাত করবে না কেন?

এখন অন্যের কথা নয়, একজন মুসলমান হিসাবে চিন্তা করুন। যদি এই সম্ভাব্য বিপদটি সত্যে পরিণত হয় তাহলে এর অর্থ কি দাঁড়াবে? এর মোকাবিলা করার কথা কি আপনি চিন্তাও করতে পারবেন? অন্যদের দৃষ্টিতে এ ধরনের ঘটনা যতই অগুরুত্বপূর্ণ বরং আনন্দময় হোক না কেন কিন্তু একজন মুসলমান যতক্ষণ সে মুসলমান থাকে তার দৃষ্টিতে এর চাইতে বড় ভয়াবহ দুর্ঘটনা আর হতেই পারে না। কারণ তার দৃষ্টিতে ঈমানই মুসলমানের আসল পুঁজি। এর ওপরই তার মুসলমান হওয়া নির্ভর করে। এটা না হলে মুসলমান শব্দের কোনো অর্থই থাকে না। দুনিয়ার সমস্ত স্বার্থ ও সম্পদ একসাথে করলেও এর মূল্য আদায় করা যাবে না। এটা এমন একটা সম্পদ যা হারিয়ে গেলে সবকিছু হারিয়ে যায়। তাই এত বড় মূল্যবান সম্পদের ব্যাপারে গাফলতি করা অথবা দুনিয়ার কোনো স্বার্থের বদলে একে বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়ার চাইতে বড় বোকামি ও দুর্ভাগ্য একজন মুসলমানের জন্য আর কিছুই হতে পারে না। যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পথ কেবলমাত্র একটিই। মুসলমানের ঈমানের হেফাজত করতে হবে যেকোনোভাবেই হোক না কেন। পরিপূর্ণ সতর্কতার সাথে হেফাজত করতে হবে। কেবল সামনে যে বিপদ দেখা যায় তেমন বাস্তব বিপদ থেকেই নয় বরং দূরের সম্ভাব্য বিপদ থেকেও হেফাজত করতে হবে। অর্থাৎ কোনো বাস্তব বা সম্ভাব্য বিপদের সম্মুখীন হওয়া যাবে না।

এ ব্যাপারে কুরআন মজীদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবন করলে বিষয়টি বুঝা আরো সহজ হয়ে যাবে। কুরআন বলছে : 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের বাপ ও ভাইয়েরা যদি ঈমানকে কুফরের ওপর

অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে নিজেদের অলী তথা অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করে তারাই জালেম।' (তওবা- ২৩)

বাপ-ছেলে ও ভাই-ভাইয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক এটা দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পর্ক। তাছাড়া জন্মসূত্রে আবার প্রকৃতিগতভাবে এ সম্পর্ক আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। প্রথম থেকে প্রতিষ্ঠিত নেই এবং যে কোনো সময় চাইলে প্রতিষ্ঠিত করে নেয়া যায়, এমন ধরনের কোনো সম্পর্ক এটা নয়। কিন্তু আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী একজন মুমিনের জন্য এ ধরনের সম্পর্ক ও তার গুরুত্ব অনেকাংশে হারিয়ে ফেলে যদি কুফর ও ঈমানের বিরোধ মাঝখানে প্রাচীর সৃষ্টি করে। এ ধরনের বাপ ও ভাইয়ের মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক অধিকার যদিও স্বস্থানে মর্যাদার অধিকারী হয় এবং অপরিহার্যভাবে এ অধিকার আদায়যোগ্য হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে তবুও তাদেরকে 'অলী' (অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সাচ্চা একনিষ্ঠ সাথি) কোনোক্রমেই বানানো যাবে না। ভেবে দেখুন যে দীনের দৃষ্টিতে ঈমান ও কুফর এতটা অস্বাভাবিক গুরুত্বের অধিকারী হয় যে, তার উপস্থিতিতে এমন শক্তিশালী রক্ত সম্পর্কও তার প্রকৃতিগত মর্যাদা হারিয়ে ফেলে, সে কোনো ইসলাম অস্বীকারকারীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক কায়েম করার অনুমতি দেবে কেমন করে? অথচ এ সম্পর্ক উল্লেখিত রক্ত সম্পর্কের চাইতে কোনো ক্রমেই কম শক্তিশালী হয় না। বরং শরীয়ত তার সাহায্যে যে উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় তা ততক্ষণ পর্যন্ত হাসিল হতে পারে না যতক্ষণ তা প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অস্বাভাবিক পর্যায়ের শক্তিশালী না হয়। অন্য কথায় বলা যায়, গভীরতা ও অন্তরঙ্গতার দিক দিয়ে সে সম্পর্ককে এমন পর্যায়ের হতে হবে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও সত্যিকার সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হয়ে থাকে। জন্মসূত্রে ও আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত রক্ত সম্পর্ক যখন ইসলাম অস্বীকার করার কারণে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে তার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তখন বিয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পর্কের গুরুত্ব কোথায় থাকে! এ সম্পর্ক জন্মসূত্রে বা আপনা আপনি সৃষ্টি হয় না বরং ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

মুশরিক ও কাফেরদের সাথে মুমিন সমাজের দাম্পত্য সম্পর্ক কিভাবে তাদের ঈমান ধ্বংসের কারণ হতে পারে তার নিকৃষ্টতম বাস্তব অভিজ্ঞতা বনি ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে লাভ করা যেতে পারে। সেখানে বহুবার দেখা গেছে তারা আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে আশপাশের মূর্তিপূজারী জাতিদের সাথে বিয়ে শাদীর সিলসিলা শুরু করে দিয়েছে এবং এর ফলে তাদের মধ্যেও মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা ভাবনাও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

মোটকথা ইসলাম অস্বীকারকারী ব্যক্তিদেরকে বিয়ে করা নাজায়েয গণ্য করার পেছনে কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজ তার ব্যক্তিবর্গকে নিজেদের ঈমান ধ্বংস করার বিপদ থেকে সংরক্ষিত রাখতে সক্ষম হবে এবং মুসলিম সমাজ শিরক কুফরী ও নাস্তিকতার বিষাক্ত জীবাণু থেকে দূরে অবস্থান করবে।

প্রমাণপঞ্জি

১. এ উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন ইসলামী আইন ও বিচারের ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত লেখকের 'ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব কেন' প্রবন্ধটি।

২. এই নীতিগত ও সার্বিক হুকুমের একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে আহলি কিতাবদের মেয়েদেরকে মুসলমান পুরুষরা বিয়ে করতে পারে। সামনের দিকে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৩. কোনো কোনো আলেম এ ধরনের বিয়েকে 'বাতিল' নয় বরং 'ফাসেদ' বলেছেন। কিন্তু এই আলেমরা ইলম ও ফিকহের জগতে কোনো উল্লেখযোগ্য ও সুস্পষ্ট মর্যাদার অধিকারী নন। আর তাদের এই অভিমত শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে কোনো গুরুত্ব লাভ করতে পারেনি। সম্ভবত এই অভিমতের ওপর ভর করেই জাস্টিস আমীর আলীও এ ধরনের বিয়েকে নিছক ফাসেদ বিয়ে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ এটা এমন একটা বিয়ে হবে যেটাকে তৎক্ষণাত ভেঙে দেয়া অবশ্যই জরুরী হবে এবং দীন ও শরীয়তের দৃষ্টিতে তার কবিরা গুনাহ হওয়াও নিশ্চিত হবে। কিন্তু তা বাতিল অর্থাৎ স্বতস্ফূর্তভাবে অস্তিত্ববিহীন হয়ে যাবে না। জাস্টিস সাহেবের মতে বিয়ের ক্ষেত্রে কুফর ও শিরক কেবলমাত্র এমন এক ধরনের নিষেধের বেড়াজাল যা নিজস্বভাবে এবং ফলাফলের দিক দিয়ে 'ইদাফী' অর্থাৎ আপেক্ষিক। অর্থাৎ তা বিয়েকে একবারেই অস্তিত্বহীন করে দেয় না (জামেউল আহকাম ফী ফিকহিল ইসলাম, ১ খণ্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা, পার্সোনল' ল অব দ্য মোহামেডানস, আমীর আলী প্রণীত গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ)। আর মোল্লারও এই একই অভিমত। এছাড়া উইলসনও একই অভিমত প্রকাশ করেছেন (এ ডাইজেস্ট অব এ্যাংলো মোহামেডান' ল, ৬৪ পৃষ্ঠা)। অথচ নওয়াব স্যার আবদুর রহীম এ ধরনের বিয়েকে বাতিল বিয়ে গণ্য করেছেন (ইনস্টিটিউটস অব মুসলমানস' ল, আর্টিকেল ১৩৪ নং, ৮২ পৃষ্ঠা। মজমুয়া কাওয়ানীন ইসলাম, ১ খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, লেখক তানযীলুর রহমান-এর সৌজন্যে)। যে ব্যক্তিই কুরআন মজীদের উল্লেখিত আয়াতগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করবেন এবং সেগুলোর মূল বক্তব্য বিষয় জানার চেষ্টা করবেন তিনিই আমীর আলী প্রমুখ লেখকদের সত্য থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি অথবা সত্য পর্যন্ত পৌঁছার অক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন।

৪. এই ব্যাপক নির্দেশের মধ্যে কেবলমাত্র একটি ব্যতিক্রম। আর তা হচ্ছে, যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্ত্রী গ্রহণ না করে কিন্তু সে যদি কিতাবী হয় (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টান মহিলা) তাহলে এ অবস্থায় সকল ইমামগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাদের বিয়ে পূর্ববত বহাল থাকবে। কারণ কিতাবীর সাথে মুসলমানের বিয়ে জায়েয।

৫. দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোনো ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি দারুল কুফর থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে এলো। এক্ষেত্রে তাদের বিয়ে তো আপনা আপনিই খতম হয়ে গেলো।

৬. দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যখন দ্বিতীয় পক্ষের (যে ইসলাম গ্রহণ করেনি) সামনে ইসলাম পেশ করার পরও সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো।

৭. দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মাত্র একজনের ইসলাম গ্রহণ করার এ ঘটনা সংঘটিত হলো দারুল কুফরে। (এগুলো সবই হানাফী ফিকহের দৃষ্টান্ত। অন্য ফিকহী অভিমতগুলো জানার জন্য ফিকহী গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করুন)।

৮. যে কোনো অবস্থায়ই এ বিধান প্রযুক্ত হবে যদিও মূলনীতি ও আইন এটা দাবী করে। কিন্তু পরবর্তী যুগের উলামায়ে কেরাম যখন দেখেন কোনো কোনো অক্ষম ও অসহায় স্ত্রী নিজের জালেম স্বামীর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য অনন্যোপায় হয়ে কেবলমাত্র এজন্য মুরতাদ হয়ে যায় যে, সে এভাবে তার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হবে, তখন তারা যথার্থভাবেই এই ধরনের মুরতাদ স্ত্রীর বিয়ে না ভেঙে যাওয়ার ফাতওয়া দেন। বলখ এলাকার হানাফী আলেমগণও এই একই ফাতওয়া দিয়েছেন। মালেকী আলেমগণও একই অভিমত দিয়েছেন। (কিতাবুল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া, ৪ খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা)

৯. যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একান্তে মিলনের পূর্বে এ ঘটনা ঘটে যায় তাহলে সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, তাদের বিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে যাবে। আর একান্তে মিলনের পর এ ঘটনা ঘটলে শাফিয়ী ও হাম্বলী উলামায়ে কেরামের মতে স্ত্রীর ইদ্দত খতম হওয়া পর্যন্ত বিয়ে অটুট থাকবে। ইতিমধ্যে মুরতাদ স্ত্রী বা স্বামী যদি আবার ইসলামে ফিরে আসে তাহলে এ বিয়ে আগের মতই বহাল থাকবে।

অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, পৃষ্ঠা : ৮৬-৮৮

ইনসাফের ঝলক

আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ

এক.

হযরত উমর রা. তখন ছিলেন খলীফাতুল মুসলিমীন। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব রা. এর সাথে একটি বাগান নিয়ে তাঁর বিবাদ দেখা দিল। হযরত উমর রা. প্রস্তাব করলেন, বিচারক বা তৃতীয় পক্ষের কাছে বিবদমান উভয় পক্ষেরই যাওয়া উচিত। কাজেই তারা উভয়ে বিষয়টি নিয়ে যায়েদ ইবনে সাবিত রা. এর কাছে উপস্থিত হলেন। উমরকে দেখে যায়েদ ইবনে সাবিত বিচারকের আসন ছেড়ে দিয়ে উমরের উদ্দেশ্যে বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি এখানে তশরীফ রাখুন।
বিচারক যায়েদ ইবনে সাবিতের উদ্দেশ্যে তখন উমর রা. বললেন, যায়েদ! তুমি শুরুতেই আইন ভঙ্গ করেছ। তুমি আমাদের উভয়কে সমপর্যায়ের আসনে বসতে বল।
অতপর বিবদমান উভয় পক্ষ উমর ও উবাই ইবন কা'ব একই সারিতে যায়েদ ইবনে সাবিতের মুখোমুখি বসলেন।
উবাই ইবনে কা'ব তার বাগানের দাবী বিচারক যায়েদের কাছে উপস্থাপন করলে উমর তা প্রত্যাখ্যান করলেন। 'অভিযোগকারীর দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্যে সাক্ষী আর অভিযোগ অস্বীকারকারীর জন্যে শপথ' বিচারের এই মূলনীতির ভিত্তিতে উবাই ইবনে কাবকে সাক্ষ প্রমাণ উপস্থাপনের নির্দেশ দিলেন যায়েদ ইবনে সাবিত। উবাই বললেন, আমার কোন সাক্ষ নেই। এমতাবস্থায় বিচারক যায়েদ উমরকে বললেন, আপনাকে শপথ করতে হবে। সেই সাথে উবাইকে বললেন, উবাই! আমীরুল মুমিনকে শপথ করতে বাধ্য করো না।
ইত্যবসরে হযরত উমর রা. দাঁড়িয়ে বিচারক যায়েদ ইবনে সাবিতের উদ্দেশ্যে বললেন, যায়েদ, সবার বিচারের ক্ষেত্রেই কি তুমি এভাবে ফায়সালা করো? যায়েদ বললেন, না। তাই যদি হয় তবে যেভাবে অন্য সবার বিচার করো আমাদের ব্যাপারটিও সেভাবেই ফয়সালা করো।
উমরের একথার পর উবাই ইবনে কা'ব উমরকে কসম করার প্রস্তাব দিলে উমর বলেন, 'যে বাগানের ফল খেতে আমি কোন দ্বিধা করি না, এর ব্যাপারে কসম করতে আমার কোন কুণ্ঠা নেই। যাঁর হাতে আমার জীবন সেই পরম সত্তার কসম, আমার এই জমির মধ্যে উবাই ইবনে কা'ব এর কোন অধিকার নেই।'

লেখক : রিসার্চ অফিসার, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ।

উমরের এই কসমের পর স্বাভাবিক ভাবেই বিচারের রায় উমরের পক্ষে হয়।
সেই রায়ের পর উমর বিচারক যায়েদের ব্যাপারে যে উক্তি করেছিলেন, তা ইতিহাসে ন্যায়বিচারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উমর রা. বলেছিলেন, যায়েদ বিচারকের যোগ্য বিবেচিত হবে না, যদি সে উমর ও সাধারণ মানুষের বিচার একই মানদণ্ডে না করে। (আখবারুল কাযা : খণ্ড ১, পৃ. ১০৮, ১০৯, ১১০)

দুই.

একবার হযরত আলী রা. এর একটি শিরস্ত্রান হারিয়ে গেল। এক ইহুদীর হাতে সেটি দেখতে পেলেন হযরত আলী রা.। ইহুদী লোকটি শিরস্ত্রানটিকে কুফার বাজারে বিক্রি করার চেষ্টা করছিল। আলী ইহুদীর কাছে গিয়ে বললেন, এই শিরস্ত্রানটি আমার, এটি আমি কাউকে দান করিনি, কারো কাছে বিক্রিও করিনি। ইহুদী লোকটি বললো, শিরস্ত্রান এখন আমার কব্জায় অতএব এটি আমার। হযরত আলী তাকে বললেন, তাহলে চলো কাযীর (বিচারকের) কাছে যাই। অতপর উভয়ে কাযী শুরাইহির আদালতে হাজির হলেন। হযরত আলী শিরস্ত্রানটির মালিকানা দাবী করলে ইহুদী লোকটি তা প্রত্যাখ্যান করলো। এমতাবস্থায় কাযী শুরাইহি হযরত আলীর দাবীর পক্ষে সাক্ষী উপস্থাপনের নির্দেশ দিলেন। আলী স্বীয় পুত্র হাসান রা. এবং তারই আযাদ করা গোলামকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করলেন। কাযী শুরাইহি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ গ্রহণযোগ্য নয়। আলী তা শুনে বললেন, কি আশ্চর্য! জান্নাতী লোকের সাক্ষও গ্রহণ করা হবে না? আমি তো নবী করীম স. কে বলতে শুনেছি, হাসান ও হোসাইনকে জান্নাতে যুবকদের নেতৃত্ব দেয়া হবে।
প্রয়োজনীয় সাক্ষ না থাকার কারণে ফয়সালা যখন অবধারিতভাবে আলীর বিপক্ষে আর ইহুদীর পক্ষে এমতাবস্থায় ইহুদী লোকটি বললো, আমীরুল মুমিনীন! আমাকে আপনার অধীনস্থ বিচার আদালতে নিয়ে এলেন, আর সাক্ষী না থাকার কারণে বিচারক আমার পক্ষে রায় দিলেন, তা থেকেই আমি সাক্ষ দিচ্ছি, ইসলাম সত্যধর্ম। আমি আরো সাক্ষ দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রসূল। আমীরুল মুমিনীন, শিরস্ত্রানটি আপনারই। রাতের বেলা এটি রাস্তায় পড়ে পতিত ছিল, আমি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম।

তিন.

ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত বিচারক কাযী শুরাইহির ছেলে একদিন পিতার কাছে এলো। তখন এক লোকের সাথে তার বিরোধ চলছিল। বিরোধের ব্যাপারে ছেলে পিতার পরামর্শ চাইলে পিতা

আদালতে মামলা করার পরামর্শ দিলেন। মামলা দায়ের করা হলো। শুনানির পর কাযী শুরাইহি মামলাটি আমলে না নিয়ে খারিজ করে দিলেন। শুরাইহির ছেলে তখন পিতার উদ্দেশে বললো, এই যদি রায় হবে তবে আপনি তা আমাকে আগেই বলে দিতে পারতেন, মামলার কি প্রয়োজন ছিল? পুত্রের জবাবে কাযী শুরাইহি বললেন, এই রায়ের বিষয় যদি তুমি আগেই জেনে নিতে পারতে, তাহলে মামলায় হেরে যাওয়ার আশংকায় তুমি প্রতি[illegible]র সাথে সমঝোতা করতে উদ্যোগী হতে এবং সেই জিনিসটি কব্জা করতে। মামলার কারণে এটি কব্জা করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অপর এক মামলায় কাযী শুরাইহি নিজপুত্র আব্দুল্লাহকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেন। এরপর বিচারকের আসন ত্যাগ করে তার সহকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আবদুল্লাহর জন্যে জেলখানায় বিছানাপত্র পাঠিয়ে দাও। সেই ছেলে শাস্তি ভোগের পর মুখোমুখি হলে ছেলের উদ্দেশে তিনি বলেন, বাবা! তুমি আমার খুব প্রিয়পাত্র বটে কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি আমার কাছে তোমার ভালোবাসার চেয়েও বেশি প্রিয়। (আখবারুল কাযা : খণ্ড ১, পৃ. ৭৬, ৮০, ৯২)

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, পৃষ্ঠা : ৮৯-১০৩

ইসলামী দণ্ডবিধি

ড. আবদুল আযীয আমের

সাত

ইসলামী আইনে তাযিরী অপরাধ

অপরাধের সংগা : ফকীহদের দৃষ্টিতে অপরাধ 'শরীয়তের এমন নিষিদ্ধ কর্ম যা রোধ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা হদ অথবা তাযির ঘোষণা করেছেন।' এ সংগার দ্বারা বুঝা যায়, যে কাজের অপরাধে শাস্তি বা তাযির দেয়া হয় তা শরীয়ত প্রণেতা তথা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ। শরীয়ত প্রণেতাই সেই কাজটিকে শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করেছেন। এই সংগা থেকে আরেকটি বিষয় বুঝা যায়, কোন নিষিদ্ধ কর্ম অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় না যদি সেই অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তি না থাকে। কোন কৃতকর্মের জন্যে যদি সুনির্দিষ্ট শাস্তি না থাকে তাহলে সেটি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত নয়।[১] প্রশ্ন হলো, নিষেধাজ্ঞাগুলো কি? বা কোন ধরনের? যেগুলো অপরাধের এই সংগার আওতায় পড়ে? জমহুর ফুকাহার মতে সর্বসম্মত মূলনীতি হলো, যে অপরাধের হদ বা কাফফারা নির্দিষ্ট নয় তাতে তাযির সাব্যস্ত হয়।

কিন্তু এই মূলনীতির পরও আমরা দেখতে পাই যে, অনেক অপরাধের ক্ষেত্রে তাযিরী শাস্তি কার্যকর হয় না। পক্ষান্তরে কিছু কর্ম এমনও রয়েছে অপরাধ না হলেও এগুলো সম্পাদনকারীকে তাযিরী শাস্তি দেয়া হয়।

অপরাধ বিবেচিত হওয়ার পরও যেগুলোতে শাস্তি কার্যকর হয় না আবার শাস্তি কার্যকর হওয়ার পরও যেগুলো অপরাধ হিসেবে বিবেচিত নয় সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা জরুরী।

গোনাহ্র সংগা

কোন হারাম ঘোষিত আদেশ অমান্য করা এবং কোন ওয়াজিব ঘোষিত নির্দেশ লঙ্ঘন করা গোনাহ্ বা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, এ ব্যাপারে সকল ফকীহ্ একমত। কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন কর্ম সম্পাদন করে যা তার জন্যে হারাম অথবা এমন কোন নির্দেশ অমান্য করে যা পালন করা তার উপর ওয়াজিব তাহলে সে গুরুতর অপরাধে গোনাহ্গার বলে সাব্যস্ত হবে। যদি শরীয়তে হারাম কর্ম সম্পাদন কিংবা নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি না থাকে তাহলে এই ব্যক্তি তাযিরী শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।[২]

ওয়াজিব লঙ্ঘনের কারণে ফকীহ্গণ যে সব তাযিরী শাস্তি নির্ধারণ করেছেন সেগুলো নিম্নরূপ ঃ- যাকাত আদায় না করা, ফরয নামায আদায় না করা, আমানতের খেয়ানত করা, যেমন কারো আমানত রাখা সম্পদ ফিরিয়ে না দেয়া, এতীমের সম্পদ গ্রাস করা, কোন ওয়াকফ সম্পদের আয় উৎপাদন গ্রাস করা, কোন এজেন্সির সম্পদ অথবা অংশীদারদের অংশ নিজের কাছে থাকা সত্ত্বেও আদায় না করা তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

'কাশ্শাফুল কিনা' গ্রন্থের লেখক বলেন, বিক্রেতা যদি বিক্রির সময় পণ্যের এমন কোন ত্রুটি আড়াল করে যার ফলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তাও তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কেননা সে পণ্যের ত্রুটি আড়াল করে প্রতারণা (FRAUD) করেছে। অনুরূপ কোন জিনিস ভাড়া দেয়ার ব্যাপারে কিংবা বিয়ের ব্যাপারে ধোঁকা দেয়া অথবা কোন দ্বিপাক্ষিক ব্যাপারে এক পক্ষ যদি ধোঁকা দেয় তাহলে এসবের অপরাধে তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে। কোন বিষয়ে যদি কারো সাক্ষ দেয়া জরুরী হয় কিংবা কোন তথ্যদাতা যদি তথ্য দেয়ার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয় এমতাবস্থায় তারা যদি সাক্ষ ও তথ্য সরবরাহে ধোঁকা বা প্রতারণার আশ্রয় নেয় তবে তাযিরী শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। সেই সাথে কোন একটা জিনিস নাপাক হওয়ার কথা কেউ জানে কিন্তু জানা সত্ত্বেও সে অন্যকে তা জানায়নি। অনুরূপ কোন আমলা কিংবা বিচারক যদি তার কর্তব্য পালনে অবহেলা করে তবে তারাও তাযিরী শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। ইবনে রুশদ বলেন, কোন ব্যক্তিকে যদি বিচারক (Judge) নিযুক্ত করা হয় আর সেই ব্যক্তি বিনা কারণে বিচারকের দায়িত্ব এড়িয়ে যায় তবে বিচারকের দায়িত্ব পালনের জন্যে শাসক তাকে বাধ্য করতে পারেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তাকে কয়েদ ও দৈহিক শাস্তিও দেয়ার বিধান রয়েছে। কারণ তাকে বিচারক নিযুক্ত করার পর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। এই ওয়াজিব কর্তব্য পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে সে অপরাধ করেছে, সে অপরাধে তাকে শাস্তি দেয়া বৈধ।[৩]

হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে ফকীহ্গণ নিম্নোল্লিখিত উদাহরণ দিয়েছেন–এমন চুরি যে চোরাইকৃত সম্পদ নেসাব পরিমাণ না হওয়া কিংবা অন্যান্য কারণে চোরের উপর যদি হদ প্রয়োগ করার অবকাশ না থাকে তাহলে এ ধরনের চুরির অপরাধে তাযিরী শাস্তি নির্ধারিত হবে। অথবা পরনারীকে চুমু দেয়া, কিংবা পরনারীর সংগে একান্তে সময় কাটানো যাতে ব্যভিচার প্রমাণ করার সুযোগ নেই। ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কসম করা, প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়, মিথ্যা সাক্ষ দেয়া, চিহ্নিত অপরাধীকে আড়াল করা কিংবা আশ্রয় দেয়া। এ ধরনের কর্ম সম্পাদন করা এমন বেআইনী কাজ যার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাযিরী শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।[৪]

মুসতাহাব ছেড়ে দেয়া এবং মাকরূহ কর্ম করার বিধান

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি ওয়াজিব পালন না করা এবং হারাম কর্মে লিপ্ত হওয়া এমন ধরনের গোনাহ এগুলোর ব্যাপারে যদি শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে কোন ধরনের শাস্তি নির্ধারিত না থাকে তাহলে এসব গোনাহ করার কারণে তাযিরী শাস্তি কার্যকর করা যায়।

কিন্তু একটা বিষয় ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে যে, কোন মুস্তাহাব পালন না করা কিংবা কোন মাকরূহ কর্ম সম্পাদন করার ফলে তাযিরী শাস্তি হবে কি-না? এধরনের কাজ কি মাসিয়তের (গোনাহর) অন্তর্ভুক্ত?

উসূলে ফিকাহর কোন কোন বিজ্ঞজন মনে করেন, প্রতিটি মুস্তাহাব পালন করা আসলে শরীয়ত প্রবর্তকের উদ্দেশ্য। শরীয়ত প্রবর্তকের প্রত্যাশা হলো প্রতিটি মুস্তাহাব পালিত হোক। এর বিপরীতে প্রতিটি মাকরূহ কর্মই শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ। শরীয়ত প্রবর্তকের আকাঙ্ক্ষা হলো মানুষ এসব থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মধ্যে পার্থক্য হলো ওয়াজিব লঙ্ঘনকারী নিন্দা ও শাস্তির যোগ্য কিন্তু মুস্তাহাব পালন না করলেও কোন নিন্দা ও শাস্তি নেই।

অনুরূপ মাকরূহ ও হারামের মধ্যে পার্থক্য হলো, হারাম কর্ম সম্পাদনকারী নিন্দা ও শাস্তিযোগ্য কিন্তু মাকরূহ কর্ম সম্পাদনকারীর জন্যে নিন্দা ও শাস্তি নেই। এই নীতির ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক উসূলবিদের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব ত্যাগকারী এবং মাকরূহ সম্পাদনকারী মাসিয়াত তথা গোনাহগার বলে বিবেচিত হয় না।

কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে এমন সব কর্ম করা মাসিয়াত বা গোনাহ যেগুলো সম্পাদনকারী তিরস্কৃত ও শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হয়। এসব কাজকে তারা নিন্দনীয় মনে করেন না। অবশ্য মুস্তাহাব ত্যাগকারী ও মাকরূহ সম্পাদনকারীকে তারা শরীয়ত পরিপন্থী কর্ম সম্পাদনকারী মনে করেন, শরীয়তের অনুগত ব্যক্তি বলে মনে করেন না। তাদের বিবেচনায় এসব লোক নাফরমান।

উসূলবিদদের অপর একটি অংশের মতে মুস্তাহাব বিষয়গুলো শরীয়তের পালনীয় নির্দেশের অন্ত র্ভুক্ত নয়। অদ্রূপ মাকরূহ বিষয়গুলো শরীয়তের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না। তাই তাদের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব কর্ম করা পসন্দনীয় আর মাকরূহ কর্ম সম্পাদন অপসন্দনীয়। এদের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব ত্যাগকারী ও মাকরূহ সম্পাদনকারীকে মাসিয়তে (গোনাহে) লিপ্ত মনে করা হয় না। কারণ শরীয়তের আদেশ ও নিষেধ পালনের যোগ্য (imposition of Binding duty) ব্যক্তি ছাড়া কোন কর্ম সম্পাদন কিংবা আজ্ঞা পালন না করাকে গোনাহ বলা যায় না। বস্তুত মুস্তাহাব ও মাকরূহের মধ্যে এসব গুণাবলী অনুপস্থিত।

প্রশ্ন হলো, মুস্তাহাব ত্যাগকারী এবং মাকরূহ সম্পাদনকারীকে যদি গোনাহগার সাব্যস্ত করা না হয় তাহলে এ দুই কাজের জন্যে কি তাযিরী শাস্তি দেয়া যায়? এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এক অংশের মত হলো, শাস্তি দেয়া যেতে পারে আর অপর অংশের মত হলো মুস্তাহাব ত্যাগ ও মাকরূহ সম্পাদনের জন্যে শাস্তি দেয়া জায়েয নয়। যারা শাস্তি না দেয়ার পক্ষে তাদের দলীল হলো মুস্তাহাব ও মাকরূহ প্রমাণের ক্ষেত্রে পরিষ্কার কোন দলীল থাকে না। বস্তুত যেক্ষেত্রে পরিষ্কার কোন হুকুম বা নির্দেশ নেই সেক্ষেত্রে শাস্তিও নেই। এই মূলনীতির ভিত্তিতে কোন কোন ফকীহ বলেন, শাস্তি হওয়া বা না হওয়াই প্রমাণ করে কাজটি মুস্তাহাব না ওয়াজিব, মাকরূহ না হারাম। অর্থ্যাৎ শরীয়ত–প্রবর্তকের পক্ষ থেকে যদি কোন ব্যাপারে শাস্তি নির্ধারিত থাকে তাহলে

পরিষ্কার বোঝা যায় সেই কাজটি হারাম না হয় ওয়াজিব। আর যদি শাস্তির ঘোষণা না থাকে তাহলে বোঝা যায় কাজটি মুস্তাহাব অথবা মাকরূহ।[৫]

যেসব ফকীহ মাকরূহ কর্ম করার কারণে এবং মুস্তাহাব কর্ম না করার কারণে শাস্তি দেয়ার পক্ষে তাদের দলীল হযরত উমর রা. এর ঘটনা। এক ব্যক্তি ছাগল জবাই করার জন্যে ছাগলটি বেঁধে ফেলে রেখে ছুরি ধার দিতে শুরু করে, এটা দেখে হযরত উমর রা. তাকে তাযিরী শাস্তি দেন। যেহেতু এ কাজটি ছিল মাকরূহ। লোকটি মাকরূহ কাজটি করার কারণে উমর তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন, ফলে মাকরূহ কাজ সম্পাদনকারী এবং মুস্তাহাব কাজ ত্যাগকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে।[৬]

গ্রন্থকার বলেন, আমার অভিমত হলো, মাকরূহ কাজ সম্পাদনকারী এবং মুস্তাহাব কাজ ত্যাগকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে। কেননা অনেক ক্ষেত্রে মুস্তাহাব পালন করা এবং মাকরূহ না করার মধ্যে গোটা সমাজের মঙ্গল অমঙ্গল জড়িত থাকে। শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যই হলো সমাজকে ক্ষতিকর ও মন্দ জিনিস থেকে হেফাযত করা। মানুষকে এমন কাজে অভ্যস্ত করা যাতে সমাজের কল্যাণ থাকে এবং সমাজের অকল্যাণ থেকে মানুষকে বিরত রাখা। যেসব মাকরূহ ও মুস্তাহাব ব্যাপক সমাজের ভালো মন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট এ ধরনের মাকরূহ ও মুস্তাহাব কাজ করা ও ত্যাগের জন্যে প্রশাসন তাযিরী শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে। আমার একথার সমর্থন পাওয়া যায়, যারা মুস্তাহাব ও মাকরূহকে করণীয় ও বর্জনীয় হুকুমের আওতা বহির্ভূত মনে করেন, তারাও মুস্তাহাব ত্যাগকারীকে নিন্দা এবং মাকরূহ সম্পাদনকারীকে তিরস্কার যোগ্য মনে করেন। তাদের দৃষ্টিতে এই নিন্দা ও তিরস্কার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একথা থেকে বোঝা যায়, দুনিয়ায় নিন্দা ও তিরস্কার হালকা তাযিরের পর্যায়ে পড়ে। উল্লেখিত মতামতকে যদি ঠিক বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে মুস্তাহাব ত্যাগ করা এবং মাকরূহ সম্পাদন শাস্তি যোগ্য হওয়ার পরিণতি হলো, মুস্তাহাব ত্যাগ করা এবং মাকরূহ সম্পাদন এমন কাজ যা গোনাহ বা মাসিয়তের অন্তর্ভুক্ত না হলেও নিষিদ্ধ। আমরা তো আগেই বলে এসেছি, সেই নিষিদ্ধ জিনিসগুলো অপরাধ শরীয়ত প্রবর্তক যেগুলোকে শাস্তি যোগ্য ঘোষণা করেছেন। বস্তুত মাকরূহ সম্পাদন এবং মুস্তাহাব ত্যাগে যদি শাস্তি হয় হবে তা অপরাধের পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হবে।

মাসিয়াত বা গোনাহ ছাড়াও তাযিরী শাস্তি

কোন কোন ফকীহ বলেন, কোন কাজ যদি মাসিয়াতের পর্যায়ে না পড়ে তবুও সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য তাযিরী শাস্তি দেয়া যেতে পারে। যেমন কোন গায়ের মুকাল্লাফ ব্যক্তি (শরীয়তের নির্দেশ পালনের বাধ্যবাধকতা যার উপর নেই) যদি এমন কোন কাজ করে যে কাজের জন্য একজন মুকাল্লাফ হলেও গণকল্যাণের পরিপন্থী বলে তাকে শাস্তি দেয়ে যেতে পারে। এমন ব্যক্তিকেও শাস্তি দেয়া যেতে পারে যে কোন মুবাহ খেলাধুলাকে জীবিকার মাধ্যম বানিয়ে ফেলে। মুবাহ কোন খেলাধুলাকে জীবিকার উপায় অবলম্বনকারী ব্যক্তিই নয় যারা এতে পয়সা খরচ করে

গণকল্যাণের বিবেচনা তাদেরকেও তাযিরী শাস্তি দেয়া যাবে। জনস্বার্থের জন্যে হিজড়াদেরকেও দ্বীপান্তর করা যায় যাতে সাধারণ মানুষদের তাদের বেহায়াপনা ও নারী সদৃশ কুরুচিপূর্ণ আচার-আচরণ দেখতে না হয় এবং অসচেতন মানুষ তাদের অশ্লীল কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত না হতে পারে।[৭]
জনস্বার্থে মাসিয়াত নয় এমন কাজের জন্যে তাযিরী শাস্তি দেয়ার সমর্থন পাওয়া যায় রসূল স. এর কর্ম থেকে। চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে রসূল স. কয়েদখানায় বন্দী করেন। অতপর তদন্তে যখন জানা গেল চুরির অভিযোগে সে জড়িত নয় তখন তাকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, লোকটি এমন কোন প্রকাশ্য অপরাধ করেনি যে তাযিরী শাস্তির উপযোগী হয়েছিল।[৮]
গ্রন্থকার বলেন, আমি মনে করি, যেসব লোক নারী সদৃশ পোশাক পরে ও অঙ্গভঙ্গি করে মাসিয়তের অপরাধেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কেননা পুরুষের জন্যে নারীর সদৃশ্য হওয়া নাজায়েয। তাই যে পুরুষ এ ধরনের কাজ করবে সে অবশ্যই মাসিয়াত করল। রসূল স. চুরির অভিযোগে যে ব্যক্তিকে কয়েদ করেছিলেন, আমার মতে তদন্তের জন্যে সেটি ছিল একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা মাত্র। অভিযোগ আরোপের পর অভিযুক্তের নিরাপত্তার স্বার্থেই রসূল স. তাকে বন্দীশালায় রেখেছিলেন যাতোক্ষণ না সে তদন্তে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে। এটা ছিল জনস্বার্থে নেয়া একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এটিকে আমরা কিছুতেই তাযিরী শাস্তি বলতে পারি না। আরবী ইস্‌য়ান শব্দ থেকে মাসিয়াত শব্দের উৎপত্তি। ইসয়ান অর্থ গোনাহ, নাফরমানী ইত্যাদি। এই শব্দের উৎপত্তিগত অর্থের দিকে চিন্তা করে মাসিয়তে জড়িত ব্যক্তির বেলায় সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ব্যক্তির পারিপার্শিক অবস্থা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। প্রকৃত অর্থেই সে গোনাহগার অপরাধী কি-না। ধরুন যদি লোকটি মুকাল্লাফ-বিশ্-শরীয়ত (শরীয়তের নির্দেশ পালনের যোগ্য) না হয় তাহলে কিছুতেই তাকে গোনাহগার বলা যাবে না। যেমন কোন নাবালেগ সে তো মুকাল্লাফ নয় তাই তার কোন কর্মকে গোনাহ বলার অবকাশ নেই। এমতাবস্থায়ও নাবালেগ কোন গুরুত্বর অপরাধ করলে তাকে যে শাস্তি দেয়া হয় তা মাসিয়াত হিসেবে নয় জনস্বার্থে তার সংশোধনমূলক ব্যসস্থা হিসেবে দেয়া হয়। অনুরূপ ভাবে মুবাহ্ খেলাধুলায় জড়িত ব্যক্তি মাসিয়তে লিপ্ত নয়, কেননা যে কাজে সে লিপ্ত তা শরীয়ত পরিপন্থী বলে কোন নির্দেশ নেই এজন্য মুবাহ্ খেলাধুলাকে জীবিকার উপায় হিসেবে অবলম্বনকারী ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয় জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাযির হিসেবে নয়।[১০]
উপরের আলোচনার পর আমরা বলতে পারি জনস্বার্থে এমন কাজের ক্ষেত্রেও শাস্তি দেয়া যায় যা প্রকৃত পক্ষে মাসিয়তের পর্যায়ে পড়ে না। উল্লেখিত. মূলনীতির ভিত্তিতে যেসব লোক জনস্বার্থ পরিপন্থী কাজে লিপ্ত এবং সমাজের জন্যে ক্ষতিকর কাজে জড়িত, মাসিয়াত বা চিহ্নিত অপরাধ কর্ম না হলেও তাদের শাস্তির আওতায় আনা যায়। যেমন এমন সব লোকদের বন্দী করা যায় যারা মানুষের ইজ্জত সম্ভ্রম জীবন সম্পদে হস্তক্ষেপ করে, এ ব্যাপারটি সর্বজন বিদিত কিন্তু অভিযোগ

প্রমাণের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। অথবা এমন প্রমাণ নেই যার দ্বারা এসব ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় কিন্তু সমাজের ব্যাপক স্বার্থে এ ধরনের লোকদের কয়েদ করা জরুরী।

মাসিয়াত (গোনাহ) সাব্যস্ত হওয়ার পরও শাস্তি রহিত হয়ে যাওয়া

শরীয়তের মূলনীতি হলো, যেসব মাসিয়াত বা গোনাহর সুনির্দিষ্ট শাস্তি ঘোষিত হয়নি সেগুলোর ক্ষেত্রেই তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হয়। সেই সাথে এমন ধরনের নিষিদ্ধ কাজেও তাযিরী শাস্তি দেয়া যায় যেগুলো মাসিয়তের পর্যায়ে পড়ে না। এই মূলনীতির পরও কোন কোন ফকীহ্ একথাও বলেছেন, এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো মাসিয়তের পর্যায়ভুক্ত হলেও এ গুলোর জন্যে শাস্তি দেয়া যায় না, শাস্তি রহিত হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি নিজের কোন অঙ্গ কেটে ফেলে অথবা নিজের শরীরে আঘাত করে জখম করে ফেলে অথবা আত্মহত্যার চেষ্টা করে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ব্যক্তি অবশ্যই গোনাহ্ কর্ম করেছে যা হারাম বলে বিবেচিত, কিন্তু এসব অপরাধে কেউ শাস্তি দানের কথা বলেন না। এর অর্থ হলো কোন কোন ক্ষেত্রে কাজটি মাসিয়াত বা গোনাহ্ বলে স্বীকৃত হলেও এজন্য শাস্তি কার্যকর করা হয় না।[১৯]

গ্রন্থকার বলেন, আমার মনে হয় উপরের দেয়া উদাহরণে কৃত কর্মের জন্যে সেই ব্যক্তির উপর কিসাস প্রয়োগ কিছুতেই সম্ভব নয় তাযিরী শাস্তিও এজন্য রহিত করে দেয়া হয়েছে কারণ সে নিজেই তো দৈহিক শাস্তি ভোগ করে ফেলেছে। এরপরও তাকে পুনরায় শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন নেই। তারপরও আমার দৃষ্টিতে এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে তাযিরী শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। কেননা উল্লেখিত ব্যক্তি যদিও তার নিজের উপরই জুলুম করেছে কিন্তু নিজের জীবনের নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষা করা প্রত্যেকের জন্যেই ওয়াজিব।

অপরাধ গোনাহর সমার্থক নয়

উপরের দীর্ঘ আলোচনার সার কথা হলো 'জুরম' বা অপরাধের পরিধি 'মাসিয়াত' বা গোনাহর চেয়ে অনেক ব্যাপক। গোনাহও অপরাধের অন্তর্ভুক্ত সেই সাথে অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজগুলোও অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মুস্তাহাব ত্যাগ করা এবং মাকরূহ কর্ম সম্পাদন করা। সেই সাথে গোনাহর সংগায় পড়ে না এবং মুস্তাহাব ও মাকরূহ কর্মের সংগায় ফেলা যায় না, তবুও জনস্বার্থ এবং সমাজের কল্যাণার্থে এগুলো নিষিদ্ধ এবং এসব করলে তাযিরী শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। তাই এটা বলার সুযোগ নেই জুরম ও মাসিয়াত তথা গোনাহ্ ও অপরাধ সমার্থক বা প্রতিশব্দ।

যেসব নিষিদ্ধ কাজের জন্যে তাযিরী শাস্তি ওয়াজিব হয় এগুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত।

১. যেগুলোর সমগোত্রিয় শাস্তির জন্যে সুনির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে কিন্তু এসব শাস্তি এজন্য প্রয়োগ করা যায় না, কারণ শাস্তি প্রয়োগের শর্তাদি পুরোপুরি অপরাধীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে না।

২. এমন ধরনের জুরম বা অপরাধ যে গুলোর সুনির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে কিন্তু সংশয় বা অন্য কোন কারণে শাস্তি প্রয়োগ করা যায় না।

৩. এধরনের অপরাধ শরীয়ত যে গুলোর জন্যে কোন শাস্তি নির্দিষ্ট করেনি। এসব ব্যাপারে এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো, অপরাধের ক্ষেত্র ও অবস্থাকে ভিত্তি করে আমাদের আলোচনা ও অপরাধের প্রকারভেদ নির্ণিত হবে।

ইসলামী আইনে মানুষের দৈহিক ও প্রাণঘাতি অপরাধের শাস্তি

মানুষের সত্তার বিরুদ্ধে যে সব অপরাধ হয়ে থাকে ফকীহগণ এসব অপরাধকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত ঐ অপরাধ যাতে মানুষের মৃত্যু ঘটে। এই অপরাধকে মানুষের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ (Crime Against Person) বলা হয়। দ্বিতীয় হলো যে অপরাধে মানুষের দেহের ক্ষতি হয় কিন্তু মৃত্যু ঘটে না। এ ধরনের অপরাধকে দৈহিক অপরাধ (Crime Against Body) বলা হয়।

প্রথম প্রকার অপরাধ কয়েক প্রকার ঃ

১. ইচ্ছাকৃত হত্যা। অর্থাৎ জেনে বুঝে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে হত্যা করা।

২. ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে সামঞ্জস্য রাখে এমন হত্যা অর্থাৎ যে হত্যার ক্ষেত্রে এমন সংশয় থাকে যে হত্যাকাণ্ডটি ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘটানো হয়েছে।

৩. ভুলবশত হত্যা। যে হত্যাকাণ্ড হত্যার উদ্দেশ্যে নয় ভুলবশত সংঘটিত হয়েছে।

৪. এমন হত্যাকাণ্ড যা ভুলবশত কৃত হত্যার সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

৫. হত্যার কারণ হওয়া।

এসব হত্যা বিভাজন ও সংগার ক্ষেত্রে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। যে গুলোর বিস্তারিত আলোচনা আমরা সামনে করবো ইনশাআল্লাহ।

আর যেসব অপরাধ মানুষের দেহের বিরুদ্ধে করা হয় এবং তাতে মৃত্যু ঘটে না সেগুলোও কয়েক ভাগে বিভক্ত।

১. যে অপরাধ মানব দেহের নির্দিষ্ট কোন অংগের উপর করা হয়।

২. এমন অপরাধ যাতে মানবদেহের কোন অংগের স্বাভাবিকতা বিনষ্ট হয়ে যায়।

৩. মাথা ও চেহারার বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ ফকীহগণ যাকে 'শাজাজ' (Fracture) বলেন।

৪. এমন অপরাধ যা শরীরের বিভিন্ন অংগের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়, যাকে জখম ক্ষত বা আঘাত বলা হয়।

উল্লেখিত অপরাধগুলোর অধিকাংশের জন্যে ইসলামী শরীয়ত সুনির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস। যদি কোন কারণে কিসাস অকার্যকর হয় তাহলে রক্তপণ কিসাসের স্থলাভিষিক্ত হয় যদি না নিহতের উত্তরাধিকারীগণ বিনা প্রতিদানে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়। ক্ষমা করে দিলে হত্যাকারীর উপর দিয়্যত ওয়াজিব হয় না। কিসাসের ক্ষেত্রে হত্যাকারী যদি নিহতের উত্তরাধিকারী হয় তাহলে কিসাস কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে হত্যাকারী নিহতের উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়।

ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডেও দিয়্যত ওয়াজিব হয়। সেই সাথে অন্যান্য শাস্তি ও দেয়া যেতে পারে। যেমন উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত এবং রক্তপণ আদায়। অবশ্য রক্তপণ বা কাফফরা আদায়ের ক্ষেত্রে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ভুলবশত হত্যা অথবা ভুলবশত হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যার শাস্তি হলো জরিমানা বা দিয়্যত কাফফারা এবং উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

হত্যার কারণ হওয়ার অপরাধে শুধু দিয়্যতের শাস্তি প্রয়োগ হয়, এতে কাফফারা দিতে হয় না। কোন কোন ফকীহ ভুলবশত হত্যা এবং হত্যার কারণজনিত অপরাধে একই শাস্তির কথা বলেছেন। যেসব অপরাধে মানব দেহের ক্ষতি হয়, তা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় তবে তাতে কিসাস ওয়াজিব হয়। অবশ্য কিসাস কার্যকর করার সকল শর্তাদি অপরাধীর মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে। বিশেষ করে আঘাতকারী ও আঘাতপ্রাপ্তের ক্ষতিগ্রস্ত অংগের মধ্যে সাদৃশ্য থাকতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অংগের প্রতিশোধ আঘাতকারীর একই অংগের বিনিময়ে নেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোন কারণে যদি কিসাস রহিত হয়ে যায় তাহলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির ভিত্তিতে হয় দিয়্যত, ওয়াজিব হয় নয়তো ক্ষতস্থানের একটা ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা হয়। অপরাধীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি কারো অংগ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলেও অপরাধীর বিরুদ্ধে দিয়্যত অথবা জরিমানা ধার্য করা যায়।

উপরের আলোচনায় আমরা বুঝতে পারলাম, মানব জীবন ও মানব দেহের বিরুদ্ধে যে অপরাধ ঘটে থাকে তন্মধ্যে অধিকাংশের শাস্তি শরীয়ত আগে থেকে নির্ধারণ করে দিয়েছে। এগুলোর প্রেক্ষিত তাযিরী অপরাধের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা একথাও বুঝতে পারলাম, কতগুলো সুনির্দিষ্ট শর্তের বিদ্যমানতা ছাড়া কিসাস কার্যকর হয় না। শর্ত বিদ্যমান না থাকলে দিয়্যত ধার্য করা হয়। এ পর্যায়ে আমরা কিসাসের শর্তাবলী ও অবস্থাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করবো, যে গুলোতে কিসাস কার্যকর করার জন্যে শর্তগুলো পুরোপুরি বিদ্যমান থাকে। ফলে আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে কিসাসের মোকদ্দমাগুলোতে কিভাবে তাযিরী শাস্তি প্রয়োগের অবস্থা সৃষ্টি হয়। সেই সাথে আমরা সেই বিষয়গুলোও আলোচনায় নিয়ে আসবো যে গুলোতে আহত বা জখমের জন্যে প্রতিদান জরিমানা কিংবা বদলা দিতে হয়। কেননা প্রতিদান কিংবা জরিমানা প্রশাসনকে নয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারদের দিতে হয়। এ পর্যায়ে এ দিকটারও আলোচনা জরুরী হয়ে পড়ে দিয়্যত বা জরিমানা দেয়ার পাশাপাশি তাযিরী শাস্তি দেয়া কি জায়েয না নাজায়েয। আলোচ্যসূচির একটি অংশে থাকবে হত্যাকাণ্ডের বিভিন্ন দিক আর অন্য অংশটিতে থাকবে মানবদেহের বিরুদ্ধে কৃত বিভিন্ন অপরাধের অবস্থা।

এক. হত্যার প্রকারভেদ

১. ইচ্ছাকৃত হত্যা ঃ আমরা পূর্বেও বলেছি, ইসলামী আইনে ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি স্বরূপ কিসাস ওয়াজিব। কিন্তু কিসাস ওয়াজিব হওয়ার জন্যে কিসাসের শর্তাদি বিদ্যমান থাকা জরুরী। হত্যাকারীর সাথে সম্পৃক্ত কিসাসের শর্তাদির অন্যতম হলো, হত্যাকারী ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা

করেছে এবং এই হত্যার ইচ্ছার মধ্যে কোন ধরনের সংশয় সন্দেহ ছিল না। সেই সাথে হত্যাকারী স্বজ্ঞানে স্বাধীন ভাবে এমন কাণ্ড ঘটাতে সক্ষম এবং কোন ধরনের মাধ্যম বা সহযোগিতা ছাড়া হত্যাকারী নিজেই সরাসরি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

নিহতের সাথে সম্পৃক্ত শর্তাদি হলো, নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর সন্তানাদি নয় এমন হতে হবে। নিহত ব্যক্তি সর্ব দিক থেকে পবিত্র রক্তের অধিকারী তথা তার উপর কোন ধরনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ নেই। এবং তার রক্ত হত্যাকারীর রক্তের সমান। এছাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, নিহতের উত্তরাধিকারীগণ হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কিসাস বাস্তবায়নের দাবীদার হতে হবে। নিহতের উত্তরাধিকারীগণের পক্ষ থেকে কোন বিনিময় নিয়ে অথবা বিনিময় ছাড়াই যদি কিসাস ক্ষমা করে দেয়া হয় তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যায়।[১২] এমতাবস্থায় বিচারকের জন্যে কিসাসের নির্দেশ জারী করা জায়েয নয়। উল্লেখিত শর্তাদির কোন একটি যদি বিদ্যমান না থাকে তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যায় তবে রক্তপণ ওয়াজিব হয়। যদি না নিহতের উত্তরাধিকারীগণ রক্তপণ ক্ষমা করে দেয়।

এখন আমরা যেসব অবস্থায় কিসাস প্রয়োগের শর্তাদি বিদ্যমান থাকে না এগুলোর অবস্থা বিস্তারিত আলোচনা করবো। বিষয়গুলো বোঝার জন্য আমরা প্রতিটি অবস্থার উদাহরণ পেশ করবো।

এক. কিসাসের শর্তাদির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো হত্যাকারী ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করতে হবে এবং এতে কোন ধরনের সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারবে না। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা না করে থাকে তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে না। ওয়াজিব হবে দিয়্যত। ইচ্ছাকৃত হত্যার মধ্যে সংশয় সন্দেহ সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থার একটি হলো, হত্যাকাণ্ডে একাধিক অন্তত দুজন লোকের অংশগ্রহণ থাকা এবং তাদের অন্তত একজন যদি এমন হয় যে, সে একাকী হত্যা করলে কিসাস ওয়াজিব হতো না। যেমন দুই হত্যাকারী একজন ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে অপর জন ভুলবশত হত্যাকাণ্ডে জড়িত হয়েছে। তন্মধ্যে এমনও হতে পারে একজন মুকাল্লাফ অন্যজন গায়ের মুকাল্লাফ যেমন একজন বালেগ আর অপরজন নাবালেগ বা পাগল।

এমতাবস্থায় আবু হানিফা রা. এর অভিমত দুজনের কারো উপরেই কিসাস ওয়াজিব হবে না। উভয়ের উপরই দিয়্যত ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক র. বলেন, ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে এবং নাবালেগ বা ভুলবশত হত্যাকারীর উপর অর্ধেক দিয়্যত ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু হানিফা র. এর প্রমাণ হিসেবে বলেন, হত্যা এমন কর্ম যার কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া সম্ভব নয়। দু'জন একত্রে হত্যাকাণ্ড ঘটালে যদি একজনের উপর কিসাস ওয়াজিব করা হয় তাহলে এমন সংশয় দেখা দিতে পারে যার উপর কিসাস ওয়াজিব করা হয়েছে প্রকৃত পক্ষে তার আঘাতে মৃত্যু ঘটেনি নিহত হয়েছে অপরজনের আঘাতে যার উপর কিসাস ওয়াজিব করা হয়নি। এ কারণে বিষয়টির মধ্যে একধরনের সংশয় জন্ম নেয়। আর সামান্য সংশয় দেখা গেলে তাতে কিসাস ওয়াজিব হয় না। কেননা রসূল স. এর ফরমান রয়েছে, 'সংশয়ের অবকাশ থাকলে হুদুদ ও কিসাস রহিত করে দাও।' বস্তুত কিসাস যখন রহিত হয়ে গেল তখন এর বিকল্প দিয়্যত সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় মতের ভিত্তি জনস্বার্থ। জনস্বার্থের চাহিদা হলো মানুষের জীবন ও রক্তের নিরাপত্তার ব্যাপারটিতে কঠোরতা অবলম্বন করা। সেই সাথে হত্যাকাণ্ডে দু'জনের সম্পৃক্ততা মানে এরা উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে হতাকাণ্ডে জড়িত। অতএব বিচার করার ক্ষেত্রে এ দিকটি সামনে রেখে ভিন্নভিন্ন ভাবে ফয়সালা করতে হবে। একজনের ব্যাপারে যদি কোন কারণে ভিন্ন ফয়সালাও হয় তবে তা অপর জনের ফয়সালার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব সৃষ্টি করবে না।

গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তই বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ যৌথ হত্যাকাণ্ডে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর ক্ষেত্রেই কিসাস সাব্যস্ত হবে। তার সহযোগী ব্যক্তির অবস্থার কারণে যদি ভিন্ন ফয়সালা হয়ে থাকে তবে তা অপর সহযোগীর বিচারে কোন প্রভাব ফেলবে না। কারণ একজনের ক্ষেত্রে তো কিসাস কার্যকর হওয়ার সকল শর্তাদি বিদ্যমান। মূল কথা হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর প্রধান শর্ত তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।[১৩]

অথবা এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে, যদি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অমুকের আঘাতেই নিহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে এবং সে হত্যার ইচ্ছাতেই আঘাত করেছিল তাহলে ইমাম আবু হানিফার মতে যে সংশয়ের অবকাশ থাকে তা মূলেই দূরিভূত হয়ে যায়। আমি মনে করি এমতাবস্থায় ইমাম আবু হানীফার মতেও কিসাস প্রয়োগ করা জরুরী।[১৪]

দুই. কোন ফকীহ ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হওয়ার জন্যে এ শর্তারোপও করেছেন হত্যাকাণ্ড হত্যাকারী নিজে সংঘটিত করতে হবে। যদি সে হত্যার কারণ ঘটে তাহলে তার উপর কিসাস কার্যকর হবে না। হত্যার কারণ হওয়ার অর্থ কোন ব্যক্তি যদি হত্যার জন্যে এমন সব আয়োজনের ব্যবস্থা করে যে আয়োজনের ফলেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। হত্যার নির্দেশদাতা এবং যে নির্দেশ পালন করে হত্যাকাণ্ড ঘটায় উভয়েই হত্যার উপাদানের পর্যায়ভুক্ত। এ দ্বারা আরো নানা ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে এখানে গুরুত্ব অনুযায়ী এক দু'টি অবস্থার আলোচনা করলাম মাত্র এবং এক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের মতভিন্নতাও উপস্থাপন করলাম।

* হত্যার হুকুমদাতা এবং হত্যাকাণ্ড সংঘটকের অবস্থা সাধারণত দু'পর্যায়ের হতে পারে। ফকীহগণ এতে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন।

ক. এক অবস্থা হলো হুকুমদাতা ও হুকুম পালনকারীর মধ্যে বাধ্য করা ও জোর জবরদস্তির মতো কোন অবস্থা না থাকা। আর অপরটি হলো এমন ধরনের কোন বাধ্যকরণের মতো অবস্থা না থাকা মানে হত্যাকারীকে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে বাধ্য না করা।

প্রথম অবস্থায় ইমাম মালেক, শাফেয়ী, ছাওরী, আহমদ র. ও আরো কিছু সংখ্যক ফকীহর অভিমত হলো, যে প্রত্যক্ষ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে কিসাস তার উপর কার্যকর হবে এবং যে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে তার উপর তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে। কিন্তু কোন কোন ফকীহ বলেন, কিসাস মদদদাতা ও হুকুম পালনকারী উভয়ের উপর কার্যকর হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে হুকুম দাতার হুকুম পালনকারীর উপর কর্তৃত্ব রয়েছে অথবা হুকুমদাতা যদি অপর কাউকে শক্তি প্রভাব বা জোর প্রয়োগ করে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে বাধ্য করে থাকে ফকীহগণ এ ক্ষেত্রে তিন ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন। কোন কোন ফকীহ বলেন, হত্যার হুকুমদাতাকেই কিসাস স্বরূপ হত্যা করতে হবে। এবং হুকুম পালনকারীর উপর তাযিরী শাস্তি সাব্যস্ত হবে। এমত ব্যক্ত করেছেন দাউদ জাহেরী, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ র.। ইমাম শাফেয়ী র. এরও উল্লেখিত মতের সমর্থনে একটি অভিমত রয়েছে। অন্য ফকীহগণ বলেন, হুকুমদাতা নয় হুকুমপালনকারীর উপর কিসাস বাস্তবায়ন করা হবে। কেননা হত্যাকাণ্ডটি সরাসরি তার দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। একথার সমর্থনেও ইমাম শাফেয়ীর আরেকটি অভিমত রয়েছে। ইমাম মালেক ও আরো কতিপয় ফকীহ বলেন, হত্যার হুকুমদাতা ও হুকুমপালনকারী উভয়কেই কিসাস স্বরূপ হত্যা করতে হবে।

এই মত ভিন্নতার ভিত্তি হলো, যারা হুকুমপালনকারীকে কিসাস থেকে মুক্ত রাখতে চান তারা নির্ভর করেন ওই দলীলের উপর যে দলীলে বলা হয়েছে, 'একজন আজ্ঞাবহ ব্যক্তি যে ব্যক্তির কোন স্বাধীনতা বা স্বকীয়তা নেই তার মতো।' একথাও তো সর্বজনবিদিত কাউকে আজ্ঞা পালনে বাধ্য করার দ্বারা অনেক দায়িত্ব রহিত করে দেয়।

আর যারা নির্দেশ পালনকারীকে কিসাস স্বরূপ হত্যার পক্ষে মত দিয়েছেন, তাদের দলীল হলো এ ব্যক্তি একদিক থেকে স্বশাসিত অন্য দিক থেকে আজ্ঞাবহ। যেমন উপর থেকে নিচে নামার সময় একজন মানুষকে বাতাস এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে ফেলে দেয়। যারা উভয়কেই কিসাস স্বরূপ হত্যার পক্ষে মতামত দিয়েছেন, তারা হুকুমপালনকারীকে জোর জবরদস্তির জন্যে অসহায় মনে করেন না, সেই সাথে হুকুমদাতাকে সরাসরি হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করার জন্যে নির্দেশদাতা মনে করেন না। আর যারা শুধু নির্দেশদাতাকে হত্যার পক্ষে তারা সরাসরি হত্যাকারীকে নিষ্প্রাণ অস্ত্রের সাথে তুলনা করেন। কেননা হুকুম পালনকারী হুকুমদাতার হাতের খেলনা মাত্র। হুকুমদাতা যে হুকুম করে তার পক্ষে সেটি রদ করা সম্ভব হয় না। মালেকী ফকীহগণ তাদের মতের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে বলেন, এ ব্যাপারে তো সবাই একমত যে, কোন ব্যক্তি যদি ক্ষুধার জ্বালায় মরণাপন্ন হয় তবুও অন্য কোন মানুষকে হত্যা করে তার গোশত খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা বৈধ নয়।[১৫]

যেসব ফকীহ হত্যাকারী ও হুকুমদাতা উভয়কেই কিসাস স্বরূপ হত্যার পক্ষে, তাদের মতটি বর্তমানে প্রচলিত মিসরীয় তাযিরী আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মিসরীয় আইনে অপরাধীর সহযোগিতাকারীর জন্যে সেই শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে সরাসরি অপরাধে জড়িত ব্যক্তিকে যে শাস্তি দেয়া হয়। কোন অপরাধে উৎসাহিত করা, অপরাধকে সমর্থন করা এবং সহযোগিতা করা একই ধরনের অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। হত্যার নির্দেশ দেয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হত্যাকাণ্ডে উস্কানী দেয়ার সমার্থক। এর ভিত্তিতে আধুনিক আইনের পারিভাষায় হত্যার হুকুমদাতাকে হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীর সাথে যুক্ত মনে করা হয়।[১৬]

২. কোন কারণে হত্যাকারী রূপে গণ্য হওয়া

কারো হত্যার কারণ হওয়ার অবস্থা হলো, যেমন কোন ব্যক্তি কারো বিরুদ্ধে সাক্ষ দিলো সে হত্যা করেছে। এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর সাক্ষদাতা তার দেয়া সাক্ষ প্রত্যাহার করে বললো, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে হত্যা করানোর জন্যেই সে জেনে বুঝে মিথ্যা সাক্ষ দিয়েছিল। অথবা কোন বিচারক সন্দেহাতীতভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধ জেনেও তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলো। এরপর বিচারক স্বীকার করলো দণ্ডিত লোকটিকে নিরপরাধ জেনেও সে জেনে-বুঝে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

এ অবস্থায় ফকীহগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। তাঁদের একদল বলেন, কারণগত হত্যার জন্যে যেমন মিথ্যা সাক্ষ অথবা মিথ্যা বিচার অথবা এ ধরনের অপরাধে হত্যার কারণ হলে এমন অপরাধীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না। কারণ এরা যদিও হত্যার উপাদান তৈরি করে কিন্তু উপাদান কাউকে নিহত হতে বাধ্য করে না। যেমন কোন ব্যক্তি অন্যকে গর্তে ফেলার জন্যে যদি গর্ত খোঁড়ে তাহলে সেই গর্তে নিপতিত হতে সে লোকদের বাধ্য করে না। তাছাড়া এই অবস্থাগুলোতে কিসাস বাস্তবায়নের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সমতা বজায় রাখাও সম্ভব নয়। কেননা, কিসাস বাস্তবায়ন করলে যে ব্যক্তি হত্যার কারণ হলো, সেতো সরাসরি মৃত্যুদণ্ডে নিহত হবে কিন্তু যে হত্যার কারণে সে অভিযুক্ত হয় সে কিন্তু সরাসরি সেই হত্যায় জড়িত ছিল না। ফকীহদের এ দলটি স্বেচ্ছায় সরাসরি হত্যাকাণ্ড এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার কারণের হত্যাকারীর মধ্যে পার্থক্য করেন। যদিও তারা মনে করেন, উভয় ক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ড স্বেচ্ছায় ঘটেছে। পার্থক্য করার ফলে তারা প্রথম অবস্থায় কিসাস সাব্যস্ত করেন কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় কিসাস সাব্যস্ত করেন না।

অপর একটি দল বলেন, কারণগত হত্যাকারী সরাসরি ঘাতক রূপেই গণ্য এবং তার উপরও কিসাস কার্যকর হবে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ র. এ মত ব্যক্ত করেন। তাদের প্রমাণ হলো, বর্ণিত অবস্থায় সাক্ষী বা বিচারক এমন ব্যবস্থা সম্পন্ন করে যার পরিণতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাণহানির শিকার হয়। তাই তাদের উপরও অনুরূপ কিসাস ওয়াজিব হবে যে রূপ হত্যাকারীর সাথে হত্যা করতে বাধ্যকারীরও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এই ফকীহগণ উদাহরণ স্বরূপ বলেন, কাসিম বিন আব্দুর রহমান সূত্রে বর্ণিত, হযরত আলী রা.-এর দরবারে দুই সাক্ষী এক ব্যক্তির চুরির ব্যাপারে সাক্ষ দেয়, তাতে হযরত আলী অভিযুক্তের হাত কেটে দেন। এর পর সাক্ষদানকারীরা তাদের দেয়া সাক্ষ প্রত্যাহার করে। হযরত আলী তখন বলেন, আমি যদি জানতে পারতাম তোমরা জেনে বুঝে মিথ্যা সাক্ষ দিচ্ছো, তাহলে আমি তোমাদের হাত কেটে দিতাম । যেহেতু তারা স্বেচ্ছায় মিথ্যা সাক্ষ দিয়েছে এর কোন প্রমাণ ছিল না তাই হযরত আলী তাদের উপর হাতের দিয়্যত দেয়ার হুকুম জারী করেছিলেন। এই ঘটনা থেকে বুঝা গেল, হযরত আলীর দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে কারো হাত কাটানোর জন্যে যদি মিথ্যা সাক্ষ দেয়, তাহলে সে বরং এমন কাজের ইচ্ছা করলো যার পরিণতি হবে হাত কাটা। সেই পরিণতি যদি বাস্তবে ঘটে যায় তাহলে

সেই ব্যক্তির উপরও কিসাস ওয়াজিব হবে। কারণ সে ইচ্ছাকৃতভাবে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির হাত কর্তনের কারণ হয়েছে। এছাড়া এটিও বিবেচ্য বিষয় যে, যেসব অপরাধে কিসাস ওয়াজিব হয় তাদের অধিকাংশের পিছনে কোন না কোন কারণ থাকে। এখন আমরা যদি প্রত্যক্ষ হত্যার সাথে জড়িত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই শুধু কিসাস সীমাবদ্ধ রাখি আর পরোক্ষ হত্যাকারীর উপর কিসাস ধার্য না করি তাহলে হুশিয়ার অপরাধীরা সরাসরি হত্যাকাণ্ডে জড়িত না হয়ে পরোক্ষ হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠবে ফলে কিসাসের বিধানটির কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাবে।[১৭]

সার কথা হলো, ইমাম আবু হানিফা র. ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুঘটক হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব বলে মনে করেন না। যদিও অধিকাংশ ফকীহ্ এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে কিসাস ওয়াজিব বলে মনে করেন। গ্রন্থকার বলেন, দ্বিতীয় পর্যায়ের ফকীহদের সাথে আমিও একমত। কারণ যারা হত্যার কারণ ঘটে এদের দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়, তাই তারা সেই অস্ত্রের সাথে তুলনীয় যে অস্ত্রের দ্বারা সাধারণত হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকে। বস্তুত এধরনের অস্ত্রের দ্বারা যখন কোন হত্যাকাণ্ড ঘটে যায় তখন অধিকাংশ ফকীহ্ কিসাস ওয়াজিব বলে মনে করেন।

নিহত ব্যক্তি যদি হত্যাকারীর অংশ হয়

নিহত ব্যক্তি যদি হত্যাকারীর অংশ হয় তথা হত্যাকারীর সন্তানের পর্যায়ভুক্ত হয়। যেমন হত্যাকারী বাপ বা বাপের সমতুল্য এমন ব্যক্তি যদি সন্তানকে হত্যা করে। কিংবা হত্যাকারী যদি মা বা মায়ের সমতুল্য হয় তাহলে ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম ছাওরী র.এর মতে এধরনের হত্যাকাণ্ডে কিসাস নেয়া যাবে না। স্বভাবত এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটে না। স্বভাবত মা বাপ সন্তানের প্রতি স্নেহপরায়ণ হয়ে থাকে এমতাবস্থায় কোন কারণ ছাড়া সন্তানকে কেউ হত্যা করতে পারে না। ফলে এমন হত্যাকাণ্ডে সংশয় দেখা দেয়। আর যে কোন ধরনের সংশয়ে কিসাস রহিত বা মওকুফ হয়ে যায়। যে কোনভাবে কিসাস রহিত হয়ে যাওয়ার সুবিধাটা হত্যাকারীর পক্ষে যায়। উপরন্তু পিতা যেহেতু সন্তানের জন্মগ্রহণের উৎস তাই সন্তানের হত্যার কারণে উৎস হত্যার শিকার হবে না। অনুরূপ ফয়সালা মা, দাদা-দাদী, নানা-নানীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এরা সবাই বাপ মায়ের সাথে তুলনীয় তাই সন্তান কিংবা নাতি-নাতনীর হত্যার কারণে তাদের কারো উপর কিসাস সাব্যস্ত হবে না।[১৮]

নিহতের উত্তরাধিকারীদের কেউ যদি হত্যাকারীর অধস্তন বংশধর হয় তাহলে হত্যাকারীর উপর কিসাস সাব্যস্ত হয় না। কেননা, হত্যাকারীর অধস্তন বংশধরের উপর কিসাস ওয়াজিব হয় না। কারণ কিসাস এমন এক শাস্তি যার কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া সম্ভব নয়। ফলে এধরনের মোকদ্দমায় নিহতের উত্তরাধিকারীদের দিয়্যত প্রাপ্য হবে।[১৯]

ইমাম মালেক র. বলেন, বাপ কিংবা দাদা যদি পুত্র অথবা নাতিকে তরবারী কিংবা লাঠি দিয়ে হত্যা করে এমতাবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হবে না। কিন্তু বাপ কিংবা দাদা যদি সন্তান বা নাতিকে শুইয়ে গলাকেটে হত্যা করে তাহলে তাদের উপর কিসাস অবধারিত হবে।[২০]

তথ্যপঞ্জি

১. ফকীহদের দেয়া জুরম্ বা অপরাধের সংগা আধুনিক ও মানুষের তৈরি আইনে বর্ণিত অপরাধের সংগার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আধুনিক আইন বিশারদগণও বলেন, আইন যে সব কর্ম করা বা লংঘন করার জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে এগুলোই অপরাধ। যে সব কাজ করা বা না করার জন্যে শাস্তি নির্দিষ্ট থাকে না সেগুলো অপরাধ হিসেবে বিবেচিত নয়। দেখুন, আল আহকামুল আম্মাতু ফি কানুনিল উকুবাত, ড. সাঈদ মুস্তফা সাঈদ পৃষ্ঠা ২৬, প্রকাশ ১৩৭১ হিজরী মোতাবেক ১৯৫২।

২. তাবসিরাতুল হুক্কাম, ইবনে ফারহুন খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৩৬৬-৩৬৭, মুঈনুল হুক্কাম পৃষ্ঠা-১৮৯, কাশশাফুল কিনা' আন-মাতানিল আকনা' খণ্ড-৪ পৃষ্ঠা ৭৫, আসসিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ ইবনে তাইমিয়া পৃষ্ঠা-৫৫ আলহাবসাতু ফিল ইসলাম, ইবনে তাইমিয়া পৃষ্ঠা-৩৮। আল আহকামুস্ সুলতানিয়া, আবু ইয়ালা পৃষ্ঠা-২৪৪। আল আহকামুস সুলতানিয়া আলমাওয়ারদী পৃষ্ঠা-২১০। ওয়াজিব এবং হারাম এর সংগার জন্যে দেখুন ইলমে উসূলে ফিকাহ, আব্দুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ পৃষ্ঠা-১১৬ ও পৃষ্ঠা-১২৫, প্রকাশ ১৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৪ খৃ:। সেখানে বলা হয়েছে, শরীয়ত প্রবর্তক সুনির্দিষ্ট ভাবে আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালনে সক্ষম মানুষকে যে কর্ম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তাকেই বলে ওয়াজিব। আর হারাম হলো শরীয়ত প্রবর্তক আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালনে সক্ষম মানুষকে যে কর্ম না করার নির্দেশ দিয়েছেন তাই হারাম।

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, হানাফীগণ ওয়াজিব ও ফরযের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। হানাফীদের মতে ফরয হলো সেই নির্দেশ যা সুনির্দিষ্ট এবং এর দলীল অকাট্য যার মধ্যে সংশয় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর ওয়াজিব হলো যার নির্দেশ সুনির্দিষ্ট বটে কিন্তু দলীল যান্নী এবং এতে সংশয়ের অবকাশ আছে। হানাফীদের মতে হারামের বিপরীতে ফরয আর মাকরূহের বিপরীতে ওয়াজিব।

৩. 'ওয়াজিব তরক' সম্পর্কে দেখুন, তাবসিরাতুল হুককাম ইবনে ফারহুন, হাশিয়া ফাতহুল আলী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৬। মুঈনুল হুককাম পৃষ্ঠা-১৮৯, আহকামুস সুলতানিয়া আবু ইয়ালা পৃষ্ঠা-২৪৭, আসসিয়াসাতুশ্ শারইয়্যাহ ইবনে তাইমিয়া পৃষ্ঠা-৫৫, আল জুস্সাতুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া পৃষ্ঠা-৩৮, কাশশাফুল কিনা' আলা মাতানিল আকনা' খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৭৫।

৪. তাবসিরাতুল হুককাম, ইবনে ফারহুন খণ্ড-২, পৃষ্ঠা -৩৬৭ ফাতহুল আলী আল মালিক এর হাশিয়াতে লেখা হয়েছে।

৫. প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী আইনে কোন কাজ করা এবং করা থেকে বিরত থাকা (Doing and sastention From Doing) উভয়টি বোঝানোর জন্যে আরবী ফা'আলা শব্দই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৬. আল মুস্তফা আল গাযালী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৫-৭৬, প্রথম প্রকাশ মাতবায়ে আমিরিয়া, বুলাক, মিসর ১৩২২ হিজরী। আল ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম, আবাদী, খণ্ড-১ম, পৃষ্ঠা-১৬০, প্রকাশ ১৩৩২ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ খৃ. মাতবায় আল মারূফ মিসর। এতে লেখা হয়েছে, কেউ কেউ মনে করেন, মাকরূহ ও মুস্তাহাব তাকলিফী আহকাম (Binding orders) এর অন্তর্ভুক্ত। মাওয়াহিবুল জলীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩২০, প্রথম প্রকাশ ১৩২৯ হি: মাতবায় আসসাআদাত, কায়রো, মিসর। ইলমে উসূলে ফিকাহ'র উস্তাদ শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ পৃষ্ঠা-১২৩। খাল্লাফ মুস্তাহাব এর সংগায় বলেন, মুস্তাহাব এমন বিধান শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে যা পালন করার নির্দেশ রয়েছে কিন্তু তা অলংঘনীয় নয়। এবং মাকরূহ এমন বিধান যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু তা অলংঘনীয় নয়। আত্ তাশরীউল জিনাঈ আল ইসলামী পৃষ্ঠা- ১২৯-১৩০ এবং ১৫৫-১৫৬।

৭. নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা- ১৭৩-১৭৪। হাশিয়াতু আবি যিয়া আশ্শায়খ আলী আশ্শারতিনী আলা শারহিল মিনহাজ? এটি নেহায়াতুল মুহতাজ-এর হাশিয়াতে ছাপা হয়েছে।

৮. শরহে ফাতহুল কাদির খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১৭।

৯. জনস্বার্থের প্রয়োজনে তাযিরী শাস্তির আলোচনার জন্যে দেখুন 'আততাশরীউল জিনাঈল ইসলামী পৃষ্ঠা-১৪৯।

১০. নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শরহিল মিনহাজ খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৭২।

১১. আলবাদায়ে ওয়াস সানায়ে, আলকাসানী খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৪।

১২. একথা ঠিক যে, একজন হত্যাকারীর সহযোগীর অবস্থা অপর সহযোগীর শাস্তিতে কোন প্রভাব সৃষ্টি করে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতের ভিত্তি সংশয়ের ভিত্তিতে। কারণ সংশয় কিসাস কার্যকর করার ক্ষেত্রে সর্বসম্মত একটি প্রতিবন্ধকতা। (অনুবাদক)

১৩. আলবাদায়ে খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা- ৩৩৫-৩৩৬, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ইবনে রুশদ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩২।

১৪. এটা যদি নিশ্চিত হয়ে যায় যে, হত্যাসহযোগীদের মধ্যে একজনের আঘাতেই আক্রান্ত ব্যক্তি নিহত হয়েছে, তাহলে অন্যান্য সহযোগীদের ক্ষেত্রে হত্যার অভিযোগই থাকে না। তখন তাদেরকে হত্যাকাঙ্ক্ষী, হত্যাকাণ্ডে উদ্যোগী এমন অপরাধে অভিযুক্ত করতে হবে। (অনুবাদক)

১৫. বিদায়াতুল মুজতাহিদ এবং নিহায়াতুল মুকতাসিব ইবনে রুশদ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ৩৩১-৩৩২, আলআহকামুস্ সুলতানিয়া আল মাওয়ারদী পৃষ্ঠা-২২১। আলমুগনী, ইবনে কুদামা খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৩০-৩৩১।

১৬. দেখুন, আলআহকামুল আম্মাতু ফি কানুনিন উকুবাত ড. সাঈদ মুস্তফা সাঈদ প্রকাশ ১৩১৭ হি. মোতাবেক ১৯৫২ খৃ. পৃষ্ঠা-২৮৩, আল মাউসুয়াতুল জিনাইয়্যাহ্ জুনদী আব্দুল মালিক খণ্ড-১, দফা ৬৭ জার্নাল ফিল উকুবাত খণ্ড-১, দফা ৬২৮-৬৩০।

১৭. বাদায়ে আস্‌সানায়ে আল কাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৯, আসী আল মাতালিব, আবু ইয়াহয়া যাকারিয়া আল আনসারী আশ্ শাফেয়ী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫, প্রথম প্রকাশ ১৩১৩, মাতবায় আস্ সাআদাত, মিসর। আলমুগনী ইবনে কুদামা- খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৩। আততাশরীউল জিনাঈ আল ইসলামী, আব্দুল কাদের আউদা পৃষ্ঠা ৪৫৫।

১৮. আলকাসানী খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৫, হাকায়েক, তাবঈনু শরহে কানযুদ্ দাকায়েক, ইমাম যাইলাঈ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৫, আলআহকামুস সুলতানিয়া, আলমাওয়ারদী ১২০।

১৯. আলকাসানী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৫।

২০. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, প্রথম প্রকাশ ১২২৯ হি. পৃষ্ঠা-৩৬ ও ৩৩৫। ইবনে রুশদ বলেন, ইমাম মালেক ও জমহুরের মতভিন্নতার কারণ হযরত আমর বিন শুয়ায়েব থেকে বর্ণিত হাদীস। এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বনী মাদলাজের কাতাদা নামক এক ব্যক্তি তার ছেলেকে তরবারী দিয়ে আঘাত করলে তার রান কেটে যায় এবং ক্ষত স্থান থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ছেলেটি মারা যায়। এ ঘটনায় সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জায়শাম হযরত উমর বিন খাত্তাবের কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। একথা শুনে হযরত উমর নিহতের ভাইকে একশ উট দিয়্যত দিতে নির্দেশ দেন। এর মধ্যে ত্রিশটি উট-তিন বছর বয়সী। এ প্রসঙ্গে উমর রসূল স. এর ফরমান উদ্ধৃত করেন, 'দিয়্যতের মধ্য থেকে হত্যাকারী কোন অংশ পাবে না'।
ইমাম মালেক মনে করেন, এই হত্যাকাণ্ডটি ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড ছিল না। কারণ এ ব্যাপারে সংশয় রয়েছে পিতা কি ইচ্ছাকৃতভাবে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছিল না এমন কোন ইচ্ছা ছিল না? জামহুর মনে করেন, সেটি ছিল ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড। কারণ ফকীহদের সর্বসম্মত মতামত হলো, কেউ যদি কাউকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে এবং এই আঘাতে লোকটি মারা যায় তাহলে সেটিকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড সাব্যস্ত করা হবে।'
ইমাম মালেক বলেন, এমন অবস্থায় যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তা যদি সংশয় বা কোন বিভ্রান্তির কারণে ঘটে থাকে, তাহলে অনাত্মীয় হলে হত্যাকারীর উপর ইচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ আরোপ করা হয় ধারণার প্রাবল্যের কারণে, কেননা অনাত্মীয়ের প্রতি হত্যাকারীর তেমন কোন মমতা না থাকাই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় হত্যাকারীর ইচ্ছা কি ছিল তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। পক্ষান্তরে ঘটনা যখন নিজের ছেলের ক্ষেত্রে ঘটে, তখন স্বভাবতই সন্তানের প্রতি পিতার মনে পিতৃস্নেহ বিদ্যমান, তাছাড়া সন্তানের শিষ্টাচার শিক্ষার দায়িত্বও তার উপর রয়েছে। এ কারণে অনাত্মীয় ব্যক্তির মতো এক্ষেত্রে বাবাকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী সাব্যস্ত করা যাবে না। এই যুক্তিতে ইমাম মালেক এই হত্যাকাণ্ডকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড মনে করেন না। উক্ত কিতাবে জাহেরী মতাবলম্বীদের মতামত উক্ত করে বলা হয়েছে, জাহেরীদের মতে আইনের দাবী হলো, এটিকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড সাব্যস্ত করে পিতার উপরও কিসাস প্রয়োগ করা।

অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, পৃষ্ঠা : ১০৪-১০৫

আল কুরআনে অসৎ ব্যবহার মানহানিকর আচরণ এবং গোপনে দোষ খোঁজার বিধান

মু. শওকত আলী

গীবত বা পরদোষচর্চা

১. মানুষ খারাপ কথা বলুক আল্লাহ তা পছন্দ করেন না, কারো ওপর জুলুম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা। আল্লাহ সব কিছুই শুনেন এবং সব কিছুই জানেন। (সূরা আন নিসা : ১৪৮)

২. হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশি ধারণা পোষণ হতে বিরত থাক। কেননা কোন কোন ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুজি করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ খুব বেশি তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (সূরা হুজরাত : আয়াত ১২)

সামাজিক আইন ও মৌলিক অধিকার

১. দীনের (ধর্মীয়) ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। (সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৬)

২. হে নবী এ লোকদের বলো 'আল্লাহ বলে ডাক, কি রহমান বলে– যে নামেই ডাকো না কেন তাঁর জন্য সব ভালো ভালো নামই নির্দিষ্ট।' (সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত ১১০)

৩. তোমার প্রভুর ইচ্ছাই যদি এ হতো তা হলে দুনিয়ার সব অধিবাসী ঈমান আনতো। তবে তুমি কি লোকদের মুমিন হওয়ার জন্য জবরদস্তি করবে? (সূরা ইউনুস : আয়াত ৯৯)

৪. বলে দাও, হে কাফেররা আমি সে সবের ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা কর। আর না তোমরা তাঁর ইবাদত কর যাঁর ইবাদত আমি করি। আমি তাদের ইবাদত করতে প্রস্তুত নই যাদের ইবাদত তোমরা করছো। আর না তোমরা তাঁর ইবাদত করতে প্রস্তুত যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন। (সূরা কাফিরূন : আয়াত ১-৬)

৫. যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলো বিধ্বস্ত করতে চেষ্টানুবর্তী হয় তার অপেক্ষা জালেম আর কে হতে পারে। (সূরা বাকারা : আয়াত ১১৪)

লেখক : বোর্ড সেক্রেটারী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ।

৬. প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা একটা ইবাদত প্রথা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যা তারা অনুসরণ করে চলে। অতএব হে নবী, তারা যেন এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়। তুমি তোমার প্রভুর দিকে দাওয়াত দাও। নিসন্দেহে তুমি সঠিক পথে রয়েছ। (সূরা হজ্জ : আয়াত ৬৭)
৭. এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। এমন যেন না হয় যে, এরা শিরকের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে মূর্খতা বশত আল্লাহকে গালি দিতে শুরু করবে। আমরা তো এভাবেই প্রতিটি মানবমণ্ডলীর জন্য তাদের কার্যকলাপকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের নিজেদের প্রভুর নিকট যেতে হবে। তখন তারা কি কি কাজ করছিল তা তিনি তাদেরকে বলে দিবেন। (সূরা আনআম : আয়াত ১০৮)

আইনের চোখে সমতা

১. হে মানুষ! আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। বস্তুত আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নীতিপরায়ণ। নিসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা হুজরাত : আয়াত ১৩)
২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইনসাফের ধারক হও ও আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষী হও। তোমাদের এ সুবিচার ও সাক্ষের আঘাত তোমাদের নিজেদের ওপর কিংবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়দের ওপরই পড়ুক না কেন আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোক না কেন। তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহর এ অধিকার অনেক বেশি যে, তোমরা তাঁর দিকেই বেশি লক্ষ রাখবে। অতএব নিজেদের নফসের খায়েসের অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে বিরত থেকো না। তোমরা যদি মন রাখা কথা বলো কিংবা সত্যবাদিতা হতে দূরে সরে থাকো তবে জেনে রাখো তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। (সূরা নিসা : আয়াত ১৩৫)

১. আর আল্লাহ কাউকেও অপরের তুলনায় যা কিছু বেশি দান করেছেন তোমরা তার লোভ করো না। যা পুরুষেরা অর্জন করছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে। আর যা কিছু স্ত্রীলোকেরা অর্জন করছে তদনুযায়ী তাদেরও অংশ রয়েছে। অবশ্যই আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রার্থনা করতে থাকবে। আল্লাহ নিশ্চয় প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। (সূরা নিসা : আয়াত ৩২)

ইসলামী আইন ও বিচার
গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার' এর গ্রাহক / এজেন্ট হতে চাই

☐ আমার জন্য ☐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ☐ বছরের জন্য ☐ কপি প্রতি সংখ্যা

নাম ....

পদবী ....

পেশা ....

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

ঠিকানা ....

.... ফোন/মোবাইল: ....

গ্রাহক পত্রের সঙ্গে .... টাকা নগদ/মানি অর্ডার করুন।

কথায় (..)।

স্বাক্ষর
ম্যানেজার

স্বাক্ষর

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না, ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন
২০ কপির উর্ধে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

=> ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ৩৫X৪ = ১৪০/=
=> ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) =৩৫X৮ = ২৮০/=
=> ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য- (বার সংখ্যা) =৩৫X১২ = ৪২০-২০=৪০০/=

গ্রাহক ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন, ১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

REGD. NO. DA 237(1) ISLAMI AIN O BICHAR : July-September -2006, TK : 35